প্রাণের প্রিয়তমা

আমির ইশতিয়াক

প্রাণের প্রিয়তমা

আমির ইশতিয়াক

ছবি: অনলাইন থেকে সংগৃহীত

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ২০০৬ খ্রিঃ
দ্বিতীয় সংস্করণঃ জুন ২০০৯ খ্রিঃ
তৃতীয় সংস্করণঃ অক্টোবর ২০১১ খ্রিঃ
পিডিএফ অনলাইন সংস্করণঃ জুলাই ২০১৭ খ্রিঃ

প্রকাশকঃ
মোঃ আবু হানিফ
গ্রামঃ ইকুরিয়া
ডাকঘরঃ ঢাকা জুট মিলস্
থানাঃ কেরাণীগঞ্জ
জেলাঃ ঢাকা।
একতা প্রকাশ
৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

অনলাইন প্রকাশকঃ লেখক

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক

প্রচ্ছদঃ লেখক

কম্পিউটার কম্পোজঃ
আমির ডিজিটাল কম্পিউটার্স।
২০৩, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী।

উৎসর্গঃ

আমার দাদা মরহুম পান্ডব আলী মোল্লাকে।
যিনি আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন,
আমি একদিন অনেক বড় হবো।

লেখকের প্রকাশিত বইঃ

- ❖ এ জীবন শুধু তোমার জন্য (২০০৩)
- ❖ প্রাণের প্রিয়তমা (২০০৬)

লেখকের পরবর্তী বইঃ

- ➢ পাপ

- ✍ পৃথিবীতে মা-বাবা ব্যতীত আর কেউ নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা দিতে পারে না। – আমির ইশতিয়াক
- ✍ প্রেম মানুষকে সংযমী, চরিত্রবান, বলবান, সাধনায় দৃঢ়বান করে, আর যুবককে করে সংগ্রামশীল, মহৎ ও গৌরবশীল। – ডাঃ লুৎফর রহমান

কাহিনী সংক্ষেপ

সাকিব অসহায় পরিবারের একজন সন্তান। সে মায়ের পেটে থাকাবস্থায় তার পিতা সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়। হঠাৎ করে তাদের পরিবারে নেমে আসে দু:খ দুর্দশা। সাকিবের জন্মের পর তার মা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় আপন দেবরের সাথে। সোনিয়া ধনাঢ্য পরিবারের একমাত্র মেয়ে। টাকা পয়সার অভাব নেই। সোনিয়ার বাবা একজন অসৎ চরিত্রের মানুষ। বাবার কাছ থেকে সোনিয়া কোন ভালোবাসা পায়নি। এতো টাকা পয়সার মাঝেও তার পরিবারে কোন সুখ নেই। এক দুর্ঘটনায় সোনিয়া তার মাকে হারায়। মাকে হারিয়ে বাবার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয় সে। ভালোবাসাহীন মেয়েটি প্রেমের টানে অসহায় এতিম সাকিবের হাত ধরে ভালোবাসার পরশ পায়। এমনই সমাজের টুকরো টুকরো কঠিন বাস্তব ঘটনাগুলো নিয়েই "প্রাণের প্রিয়তমা" উপন্যাসের কাহিনী তৈরি হয়েছে।

কিছু কথা

সু-প্রিয় পাঠক-পাঠিকা আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন। আপনাদের ভালোবাসায় ধন্য হয়ে আমার দ্বিতীয় উপন্যাস 'প্রাণের প্রিয়তমা' উপহার দিতে পেরে প্রথমেই মহান প্রভুর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আমার প্রথম উপন্যাস 'এ জীবন শুধু তোমার জন্য' পড়ে যারা আমাকে চিঠি লিখে অনুপ্রাণিত করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। আপনাদের প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম ভালোবাসা। আপনাদের বিপুল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বুকভরা আশা নিয়ে আমার দ্বিতীয় উপন্যাসটি আপনাদের নিকট হাজির করলাম। আশা নয়; দৃঢ় বিশ্বাস এখানেও আমি নিরাশ হবো না।

যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি আমির ইশতিয়াক আপনাদের ভালোবাসায় ধন্য হতে পেরেছি তাদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে যাঁদের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তারা হচ্ছেন– একতা প্রকাশের স্বত্বাধিকারী ও বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক মো: আবু হানিফ, নরসিংদী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আরশীতে মুখ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক আসাদুজ্জামান রিপন, মাসিক 'ভোরের কলরব' এর সম্পাদক জাকির হোসাইন বাবলু, তরুণ কবি রাকিব হাসান রুবেল, নরসিংদীর 'জনপ্রিয় লাইব্রেরী'র স্বত্বাধিকারী আলমগীর হোসেন ও আমার বড় ভাই কবি আবু ইউসুফ।

আমার উপন্যাসটি পড়ে আপনাদের যদি বিন্দুমাত্র ভালো লাগে তাহলে আমি মনে করব আমার লেখা স্বার্থক হয়েছে। আশা করি আমার প্রথম উপন্যাসটির মতো এ উপন্যাসটি পড়েও আমাকে চিঠি লিখে অনুপ্রাণিত করবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমার এই উপন্যাসটি প্রথমে জুলাই ২০০৬ খ্রিঃ এ 'আমির হোসেন' নামে প্রকাশ হয়। বর্তমানে পিডিএফ অনলাইন সংস্করণে আমার নতুন নাম 'আমির ইশতিয়াক' নামে প্রকাশ হলো।

পরিশেষে উপন্যাস ভক্ত সকল পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছ ও অভিনন্দন। ধন্যবাদ সবাইকে।

লেখক–
০১৭১০৮৩১৯১১

লেখক পরিচিতি

ছবিটি তুলেছেন: ইয়াছমিন আমির

আমির ইশতিয়াক ১৯৮০ সালের ৩১ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার ধরাভাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শরীফ হোসেন এবং মা আনোয়ারা বেগম এর বড় সন্তান তিনি। স্ত্রী ইয়াছমিন আমির। এক সন্তান আফরিন সুলতানা আনিকা। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন মায়ের কাছ থেকে। মা-ই তার প্রথম পাঠশালা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন মাদ্রাসা থেকে আর শেষ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নরসিংদী সরকারি কলেজ থেকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। তিনি লেখালেখির প্রেরণা পেয়েছেন বই পড়ে। তিনি গল্প লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও সাহিত্যের সবগুলো শাখায় তাঁর বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বেশ কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো- এ জীবন শুধু তোমার জন্য (২০০৩) ও প্রাণের প্রিয়তমা (২০০৬)। তাছাড়া বেশ কিছু সম্মিলিত সংকলনেও তাঁর গল্প ছাপা হয়েছে। তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রিন্ট ও অনলাইন পত্রিকায় গল্প, কবিতা, ছড়া ও কলাম লিখে যাচ্ছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্লগ ও ফেসবুক গ্রুপে নিজের লেখা শেয়ার করছেন। তিনি লেখালেখি করে বেশ কয়েটি পুরস্কারও পেয়েছেন। তিনি প্রথমে আমির হোসেন নামে লিখতেন। বর্তমানে আমির ইশতিয়াক নামে লিখছেন। বর্তমানে তিনি নরসিংদীতে ব্যবসা করছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একজন সফল লেখক হওয়া।

তার ফেসবুক লিংক-https://www.facebook.com/amirhossain243
ই-মেইল-amirishtiaq3110@gmail.com

- প্রকাশক

বসন্তের পড়ন্ত বিকেল। রমনাপার্কের এক পাশে আনমনাভাবে দাঁড়িয়ে আছে সোনিয়া। চোখ দু'টো পার্কের মধ্যে প্রবেশ করতেই দেখতে পেল যুগল প্রেমিক-প্রেমিকারা বসে রোমান্টিক প্রেমালোচনায় মগ্ন। একে অপরকে চুমো দিচ্ছে। কোন যুগল একে অপরকে গলায় জড়িয়ে ধরে কথা বলছে। আবার কোন প্রেমিকা তার প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে সুখের স্বপ্ন দেখছে।

পার্কের এসব দৃশ্য দেখার পর সোনিয়া তার চোখ ফিরিয়ে নিল। যেন তার এসব রোমান্টিক দৃশ্য দেখে হিংসা হচ্ছে। বার বার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে তার প্রেমিক পুরুষটিকে।

ঈশ! সাকিবটা আজ কোথায় গেল? কিছু বলেও গেল না। সারা শহরের মানুষ এখানে এসে প্রেমালোচনা করছে, অথচ আমি এত কাছে থেকেও তাকে নিয়ে একটি দিনের জন্যে পার্কের এই নরম ঘাসের উপর বসতে পারি না। এখানের বৃক্ষরাজিকে সাক্ষী রেখে দু'চারটে মধুর আলাপালোচনা করতে পারি না। কতবার বলেছি, সাকিবকে এখানে আসার জন্যে কিন্তু সে এ বায়না ও বায়না দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। কেন যে এমন একটা গর্দভ পুরুষের প্রেমে পড়লাম তার হিসেব মিলাতে পারছি না। সে শুধু সারাক্ষণ তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অথচ সে বুঝে না তার প্রিয়তমার মন কি চায়। কেন একটি মেয়ে তার সব কিছু ত্যাগ করে একটি ছেলেকে ভালোবাসে? আজ বাদুরটা আসুক, ওকে প্রেম করার মজাটা বুঝাব। নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে এসব আবোল তাবোল ভাবছে সোনিয়া। আর এদিক দিয়ে মনে মনে একটি খালি রিক্সা খুঁজছে। ব্যস্তময় কোলাহল মুখরতি শহরের গাড়ীগুলো হর্ণ বাজিয়ে অবিরাম তার পাশ কেটে যাচ্ছে তাদের গন্তব্যস্থানে।

সোনিয়ার পরনে একটি আকাশী রঙের শাড়ী। সাথে ম্যাচ করা ব্লাউজ। তার নীচে অন্তবাস। যৌবনে ফুটে উঠা স্তন দু'টো যেন সব বাঁধা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। কমলার কোয়ার মত ঠোঁট দু'টোতে লাল রঙের লিপস্টিক দিয়েছে। শেষ বিকেলের রোদ লিপস্টিক মাখা ঠোঁটে পড়তেই চিক্‌চিক্ করে উঠল। ঘন কালো কেশগুলো যেন কোমর ছুঁই ছুঁই। শ্যাম্পু করা চুলগুলো মৃদু বাতাসে দুল খাচ্ছে। চোখে সানগ্লাস। কাধে ভ্যানিটি ব্যাগ। পায়ে হাইহিল জুতা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কোন এক চলচ্চিত্রের সুন্দরী নায়িকা। যেন টগবগে যৌবন তার সারা অঙ্গে ঝলমল করছে। এমন এক অপরূপা সুন্দরী নারীকে কার না দেখতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে উঠতি বয়সের ছেলেদের।

পথচারীরা একে একে তার পাশ কেটে যাচ্ছে। আবার কিছু যুবক টাইপের ছোকরা তাকে দেখে সহসা থমকে দাঁড়ায়। হা করে তার দিকে এক নজর তাকায়। তেমনি এক যুবক সহসা তার সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং বোকার মত হা করে দাঁড়িয়ে তার রূপের সুধা পিপাসিত কাকের মত পান করতে থাকে।
সোনিয়া তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধমকের সুরে বলে উঠল, এই ছেলে এভাবে কি দেখছ?
সোনিয়ার কথায় ছেলেটি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মুখে কিছু বলতে না পেরে তার পাশ কেটে চলে গেল।
এদিকে একটি খালি রিক্সা সোনিয়ার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সোনিয়া রিক্সা দেখে হাতের ইশারায় থামাল।
এক মধ্য বয়সের কুচকুচে কালো যুবক রিক্সাতে বসা। পরণে একটা ছেঁড়া শার্ট। ময়লা শার্টটি কালো হয়ে গেছে। মনে হয় যেন আজ কয়েক মাস যাবত শার্টটির সঙ্গে সাবান ও পানির মিলন হয়নি। হায়! শুধু পেটের তাড়নায় তাদের মত হাজারো যুবক জীবনের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে চলছে। স্ত্রী, সন্তানের মুখে এক চিলতে হাসি ফোঁটাবার জন্যে আজ তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে।
সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে রিক্সাওয়ালা বলল, কৈ যাইবেন আফা?
সোনিয়া বলল, ফার্মগেট।
উঠেন।
সোনিয়া রিক্সায় উঠতেই রিক্সা টুংটাং আওয়াজ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে।
সোনিয়া নিজের দুঃখ সহ্য করতে পারলেও পরের দুঃখ সহ্য করতে পারে না। সে সত্যি রূপসী কিন্তু তার মধ্যে রূপের কোন অহংকারের লেশমাত্র নেই। সে গরিবকে ভীষণ ভালোবাসে। তার জানা মতে সে কখনো কোন গরিবকে কষ্ট দেয়নি। কোন দিন সে রিক্সায় উঠার সময় ভাড়া জিজ্ঞেস করে উঠেনি। যা পাওনা তার চেয়ে একটু বেশিই ভাড়া দিয়েছে।
সোনিয়া রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, এই যে ভাইজান, আপনার নাম কি?
রিক্সাওয়ালা ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে বলল, বাছেদ।
আপনার সন্তান কয় জন?
সন্তান কি আফা?
সন্তান মানে আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন?
অ বুজছি আফা। তয় আমার এক পোলা পাঁচ মাইয়া।
একথা শুনেই সোনিয়া ভাবছে, আজ যদি সে শিক্ষা গ্রহণ করতো তাহলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জানত। তার সংসারে এত সন্তান আসতো না। আর এত অভাব

অনটনও হত না। আবার ভাবে তারই বা কি দোষ। সে তো আর ইচ্ছে করে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকেনি। হয়তো তার বাবা গরিব ছিল। অভাবের তাড়নায় তাকে শিক্ষা দিতে পারেনি। আমাদের মত যারা ধনী আছে, তারা যদি গরিবদের সাহায্য করতো তাহলে হয়তোবা এসব বঞ্চিত লোকেরা শিক্ষার আলো পেতো। এখন তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ আমাদের। আমরা যদি তাদেরকে সাহায্য করতাম, তাহলে আজ তারা এভাবে জীবন যাপন করতো না। ভিক্ষা, চুরি, বেশ্যাবৃত্তি ও ডাকাতি ছাড়া সব পেশাইতো মহৎ। শিক্ষা গ্রহণ করেতো রিক্সা চালাতে পারতো।

সোনিয়ার মত এভাবে যদি আমাদের দেশের সবাই ভাবত তাহলে আমাদের দেশে এত নিরক্ষর, অভাব-অনটন থাকত না।

সোনিয়া আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথায় থাকেন?

কল্যাণপুর রেডিও কলোনীতে থাকি।

রিক্সা চালিয়ে সংসার চলেতো?

কোন রহমে দিন চলে যায় আফা। সারা দিন রিক্সা চালিয়ে যা ট্যাহা কামাই করি তা দিয়াই রাইতে বাসায় চাইল কিন্না নিয়া যাই। পরে বউয়ে রাইন্দা পুলা মাইয়াগরে খাওয়ায়। তারপরে আমরা দুইজনে খাই। আবার বেইন্নালার আজান হলেই রিক্সা নিয়ে বের হই। এভাবে দিন চইলা যায়। একটু থেমে বাছেদ আবার বলল, তয় আফা আমডা সুখেই আছি।

বাছেদ কথায় কথায় রিক্সা চালিয়ে যাচ্ছে। সে ঘেমে একাকার হয়ে গেল। তার কপাল বেয়ে ঘাম টপটপ করে পীচ ঢালার পথে পড়ছে। মাঝে মাঝে বাছেদ তার ডান হাতের শাহাদাৎ আঙ্গুলটা দিয়ে বাঁকা করে কপালের ঘাম মুছছে।

রিক্সা শিশু পার্ক হয়ে পিজি হাসপাতালের সামনে আসতেই সোনিয়া দূর থেকে দেখতে পেল একটি যুবক অপর একটি রিক্সায় করে তার বরাবর আসছে। তার পরনে সবুজ রঙের টি-শার্ট ও সাচকিন কাপড়ের একটি প্যান্ট।

সোনিয়া এখনও চিনতে পারছে না আসলে যুবকটি কে হতে পারে। যত সময় যাচ্ছে ততই রিক্সা দু'টো সামনাসামনি হচ্ছে। একি! এতো দেখা যাচ্ছে সাকিব। কোথা থেকে আসছে? সোনিয়া তার ভালোবাসার পুরুষ সাকিবকে দেখে সহসা চমকে উঠলো কিন্তু সেই চমকে উঠা এখানেই সমাপ্ত। মুহূর্তে তার মাথায় অন্য এক চিন্তা এসে গেল। সে সাকিবকে প্রেমের শিক্ষা দেয়ার জন্যে রিক্সার হুডটি উঠিয়ে নিল এবং বাছেদকে বলল, রিক্সা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে যেতে। যেন সে প্রিয়তমকে দেখেও দেখেনি।

সোনিয়ার কথানুযায়ী বাছেদ রিক্সা ঘুরিয়ে পিছন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রিক্সা জাতীয় যাদুঘরের দিকে যাচ্ছে।

রিক্সাটি যেই ঘুরালো সেই মুহূর্তে সাকিব সোনিয়াকে দেখে ফেলল। সোনিয়াকে অন্য পথে যেতে দেখে সাকিব উচ্চ কণ্ঠে ডাকছে, সোনিয়া... সোনিয়া...।
মনে হচ্ছে সিনেমার কোন নায়ক কোন নায়িকাকে ডাকছে। কিন্তু কে শুনে তার এ আদর মাখা ডাক। তার প্রাণের প্রিয়তমা যে তাকে দেখেও না দেখার ভান করে গাল ফুলিয়ে অন্য পথে চলে যাচ্ছে তা কি সাকিব জানে?
এদিকে সাকিবের রিক্সাটিও ঐ রিক্সার পথানুসরণ করল। দু'টো রিক্সায় দ্রুত বেগে চলছে। মনে হচ্ছে যেন তারা আজ প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কার আগে কে যাবে।
সোনিয়া কিছুক্ষণ পর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে সাকিব তার পথানুসরণ করছে। সে মনে মনে বলল, এখন কেন এভাবে আমার পিছনে আসছ? আমি যখন কোথাও যেতে বলি তখনতো বায়না ধর।
দু'টো রিক্সা প্রায় কাছাকাছি হয়ে গেল। আবার সাকিব ডাকছে, প্লিজ সোনিয়া দাঁড়াও।
সত্যি চমৎকার দৃশ্য। এ দৃশ্যটা যদি নাটকে বা বাংলা ছায়াছবিতে চিত্রায়ন করা হত তাহলে খুব সুন্দর দেখাত।
এতক্ষণে রিক্সা দু'টি যাদুঘরের গেটের সামনে চলে এল। বলুনতো আর কত প্রিয়তমের সাথে অভিনয় করা যায়। শত হোক তার প্রিয়তম পুরুষতো। তাকে কি আর কষ্ট দেয়া যায়। সোনিয়ার মন নরম হয়ে গেল। সে বাছেদকে ইশারা দিতেই রিক্সা থেমে গেল।
সাকিবের রিক্সাও সামনে গিয়ে থামল। পরে সাকিব রিক্সা থেকে নেমে বলল, কি ব্যাপার সোনিয়া। তুমি আমাকে দেখে এভাবে চলে আসলে কেন?
সোনিয়া বলল, আমি তোমাকে দেখিনি।
মিথ্যে বলছ কেন?
আমি তোমার সাথে মিথ্যে বলতে যাব কেন?
সত্যি যদি না দেখে থাক তাহলে এ পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছ?
সোনিয়া মুখ ঘুরিয়ে রাগের স্বরে বলল, জাহান্নামে।
মানে!
মানে একদম পানির মত সোজা।
তুমি এসব কি আবোল তাবুল বলছ?
আবোল তাবুল নয়, যা সত্যি তাই বলছি।
আমিতো তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।
বুঝবে কি করে তুমি যে কচি খোকা।
আসলে তোমার কি হয়েছে বলতো?

কিছুই হয়নি।

তাহলে এমন করছ কেন?

এবার সোনিয়া তার চোখ থেকে সানগ্লাসটি নামিয়ে হাত উঁচিয়ে বলল, এই তুমি আমাকে এভাবে জেরা করছ কেন? আমি কি কোন আসামী?

তুমি আসামী হতে যাবে কেন? তুমিতো আমার প্রাণের প্রিয়তমা।

সোনিয়া মুখ ভেংচিয়ে বলল, আহ্হারে, তুমি যে আমার **প্রাণের প্রিয়তমা**। দেখ তোমার কথার ধরণ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পুলিশ আর আমি আসামী। তোমার দৃষ্টিতে যদি আসামী না হয়ে থাকি, তাহলে এসব বলছ কেন? কি অধিকার আছে তোমার?

ভালোবাসার অধিকার।

ভালোবাসা! কে কাকে ভালোবাসে?

কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বাহ্! সুন্দর কথা শুনালে। তাহলে এই বুঝি তোমার ভালোবাসার নমুনা। আমি সারাদিন তোমাকে খুঁজি আর তুমি টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াও। আমার একটু খোঁজও নেওনা। আমি কোথায় যাই, কি করি ইত্যাদি। আচ্ছা বলতো তুমি ভালোবেসে আমাকে কি দিতে পেরেছ? পেরেছ কি কিছু দিতে? কিছুইতো দিতে পার নাই। কেন আজ তোমাকে ভালোবেসে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পার্কের এসব দৃশ্য দেখতে হয়? তুমি কি পার না আমাকে নিয়ে একদিন পার্কে যেতে? এতটুকু বলে সোনিয়া সাকিবের পানে তাকিয়ে রইল। তার চোখের কোণায় জল যেন ছল ছল করছে।

সাকিব তার দীর্ঘ বক্তব্য শুনে বলল, কিন্তু...

রাখ তোমার কিন্তু, সারাজীবন শুধু কিন্তু কিন্তু করে যাবে, পারবে না তুমি আমাকে নিয়ে কিছু করতে।

সাকিব নিরোত্তর।

সোনিয়া আবার বলল, সারাদিন কোথায় ছিলে?

মিরপুর।

কার বাসায়?

এক বন্ধুর বাসায়।

আমার চেয়ে তোমার বন্ধু বড় হয়ে গেছে। তুমি তোমার বন্ধুর কাছে যাও। আমার কাছে এসো না। প্রতিদিন তোমার বাসায় গিয়ে ফেরত আসতে হয়। আচ্ছা বলতো এভাবে কি ভালোবাসা হয়? ভালোবাসার মানুষকে সব সময় কাছে রাখতে হয়। আর তুমি কিনা আমাকে...। সোনিয়া আর কিছু বলতে পারলো না। এখানেই থেমে গেল।

সরি সোনিয়া।

সোনিয়া বিরক্তির স্বরে বলল, সরি! সরি!! সরি!!! আর কত সরি বলবে আমাকে। আজ দুই বছর গত হচ্ছে আমাদের প্রেম। অথচ এমন কোন দিন বাদ নেই যে, তুমি সরি বলনি। তোমার সাথে আমার আর কোন কথা নেই। এখন থেকে তুমি তোমার পথ ধর। একথা বলে সোনিয়া রিক্সাওয়ালাকে ইশারা দিল সামনে যেতে। সাকিব কাঠগড়ার আসামীর মত দু'হাত করজোর করে বলল, ঠিক আছে বাবা আর এমনটি হবে না। এই মাফ চেয়ে নিলাম। আর যা করার বাসায় গিয়ে করিও। এখন রাস্তায় আমাকে আর লজ্জায় দিওনা। আজকের মত আসামীকে ক্ষমা কর।

সোনিয়ার ভালোবাসার কাছে সাকিব আজ সত্যিই হেরে গেল। এদিকে দু'টো রিক্সাওয়ালা হা করে তাকিয়ে তাদের মান অভিমানের কথোপকথন গিলছে কিন্তু তারা কিছু বলতে পারছে না। এবার সোনিয়ার মনটা প্রিয়তমের জন্যে নরম হয়ে গেল।

সোনিয়া সাকিবের হাত ধরে বলল, উঠ।

সাকিব বলল, কোথায় যেতে হবে?

আমাকে বাসায় পৌঁছে দিবে।

ঠিক আছে চল।

সাকিব তার রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে সোনিয়ার সাথে তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে রিক্সা ফার্মগেট এসে একটি তিনতলা বিল্ডিংয়ের গেটের সামনে থামলো। এদিকে সন্ধ্যা গনিয়ে এল। শহরের বিভিন্ন অলি গলিতে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল। সোনিয়া সাকিবকে টা-টা দিয়ে বিদায় করে বাসার দিকে রওয়ানা হল। আর সাকিব কিছুক্ষণের মধ্যে তার বাসায় ফিরল।

আজ থেকে পনের বছর পূর্বে সোনিয়ার মা এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে গেছেন। তখন সোনিয়ার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। একদিন মনির খান তার স্ত্রী ও মেয়ে সোনিয়াকে নিয়ে রিক্সা করে বাসায় ফিরছিলেন। এমন সময় বিপরীত দিক হতে একটি বাস এসে রিক্সার উপর তুলে দেয়। সাথে সাথে রিক্সাওয়ালা মারা যান। আর মনির খানের স্ত্রীর ডান পা একেবারে ভেঙ্গে যায় ও মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। কিন্তু সোনিয়া ও মনির খানের কিছু হয়নি। সামান্য একটু আঘাত পেল তারা। রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল রাজপথ। মুমূর্ষু অবস্থায় স্ত্রীকে মনির খান হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কয়েকদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা করে তার স্ত্রী মারা যান। সোনিয়া তার মায়ের মৃত্যুতে খুবই মর্মাহত হয়। তখন মায়ের লাশের উপর পড়ে সোনিয়া কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যায়। মনির খান মেয়েকে সান্ত্বনা দেন, কিন্তু কিছুতেই কাজ হয়নি। অবুঝ সোনিয়া মায়ের শোকে তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে রইল। দানা পানি কিছুই মুখে দেয়নি।

আজ সোনিয়া পরিপূর্ণ যুবতী কিন্তু যখনই মায়ের মৃত্যুর দৃশ্যটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠে তখনই সে পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশুর মতই ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠে। তার মায়ের মত মাটির মানুষ, এত সরল সোজা রমণী এ সমাজে খুব কমই আছে। ভালো মানুষ দুনিয়াতে বেশি দিন বাঁচে না। তাইতো সোনিয়ার মা অল্প সময়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

আর মনির খান তিনি তার স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার মত এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। তার কাছে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা বলতে কিছুই নেই। তিনি চিনেন শুধু টাকা আর নারী। টাকার জন্যে তিনি খুন করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। স্ত্রী জীবিত থাকতে তাকে পুরোপুরি ভালোবাসা দিতে পারেননি। নিজ স্ত্রীকে রেখে অন্য নারীকে নিয়ে তিনি আমোদ ফূর্তি করতেন। মাঝে মাঝে মদ্যপান করে বাড়ি ফিরতেন। অকারণে স্ত্রীকে মারধর করতেন। কিন্তু স্বামীর ভয়ে মমতাময়ী স্ত্রী কোন প্রতিবাদ করতে পারতেন না। তবু তাকে মনে প্রাণে ভালোবাসতেন। কারণ তিনি জানতেন স্বামীর পদতলে স্ত্রীর বেহেস্ত।

মনির খান এমন স্ত্রীকে হারিয়ে কিছুটা শোকাহত হলেও এখন ভুলেও তার নাম মনে করেন না। অবশ্য এখনও দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। কিন্তু এ বুড়ো বয়সেও তার নারীদেরকে নিয়ে আমোদ ফূর্তি করার পুরানো অভ্যাসটি পরিবর্তন হয়নি। দিন দিন তিনি যেন পশু হয়ে যাচ্ছেন। উপর দিয়ে দেখাচ্ছেন তিনি মেয়েকে

ভীষণ ভালোবাসেন বিধায় দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। কিন্তু তলে তলে তিনি টাকার বিনিময়ে সুন্দরী নারীদের দেহভোগ করে যাচ্ছেন। আর বোতলের বোতল মদ কিনে খাচ্ছেন। মেয়ে যে দিন দিন বড় হচ্ছে তার দিকে কোন খেয়াল নেই। আসলে তার ভেতরটা অন্ধকার রাতের মত কালো। তাইতো তিনি দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে গেছেন। আখেরাতের কথা ভুলেও মনে করেন না। নামাজ রোজা একেভারেই করেন না।

নারী লোভী মনির খান আজ বিশাল সম্পত্তির মালিক। ফার্মগেটে তিন তলা বাড়ি করেছেন। অবৈধ পথে টাকা উপার্জন করে আবার অবৈধ পথেই ব্যয় করছেন। মেয়ে সোনিয়া তার বাবার এসব কার্যকলাপ কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। মাঝে মাঝে পিতার সাথে ঝগড়া করে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যায়। পিতার এসব কু-কর্মের কারণে সে কলেজের বান্ধবীদের সাথে মিশতে পারে না। ছোট বেলায় মাকে হারিয়ে যে কষ্ট তার বুকে পাথর হয়ে চাপা আছে, তাইতো ভুলতে পারছে না। তার উপর আবার বাবার এহেন কার্যকলাপ। এসব কষ্ট নিয়ে সোনিয়া ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। এসব দুঃখের কথা কারো কাছে লজ্জায় বলতেও পারছে না। অঢেল ধন সম্পত্তির মাঝে থেকেও আজ সোনিয়ার মনে শান্তি নেই। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এই দালান কোঠা ছেড়ে কোথাও চলে যেতে। কিন্তু সে পারে না। কারণ সে তার মায়ের মত হয়েছে। আদর্শ মায়ের আদর্শ মেয়ে কিন্তু বাপটা যে এত খারাপ কি করে হল, তা সে কল্পনা ও করতে পারে না। মাঝে মাঝে সে খোদার কাছে ফরিয়াদ করে, 'হে খোদা তুমি আমাকে এমন নর পশুর ঔরসে কেন জন্ম দিলে? এর চেয়ে যদি গ্রামের দরিদ্র কৃষকের ঘরেও জন্ম দিতে তাহলেও শত গুণে ভালো হতো। কি অপরাধ করেছিলাম আমি যার জন্যে এ শাস্তি তুমি আমাকে দিচ্ছ?'

মনির খানের নামটি শুনলেই মুখটি ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে সোনিয়ার। কেউ যদি তার কাছে তার বাবার পরিচয় জানতে চায়, তখন সে বলে, আমার বাবা নেই। একই বাসাতে বাপ বেটি থাকে কিন্তু কথাবার্তা খুব কম হয়। পিতা দশটা প্রশ্ন করলে একটা উত্তর দেয়। বাড়িতে কাজের বুয়া আছে। সে তাদের রান্না বান্নার সব দেখা শুনা করে। সোনিয়া বুয়াকে দিদি বলে ডাকে।

মনির খান বেডরুমে বসে আছেন। রুমের উত্তর পাশে ছোট একটি কাঠের আলমারি। তাতে অনেকগুলো মদের বোতল স্তরে স্তরে সাজানো। যেমনি ভাবে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা তাদের দোকান বোতল দিয়ে সাজায়। তবে সবগুলো বোতলে মদ নেই। এর মধ্যে কোনটা খালি আবার কোনটা ভর্তি। পাশে একটি বক্স খাট। তাতে বেডসিট বিছানো। তার উপর দু'টো তুলার বালিশ পড়ে আছে। আরো আছে একটি ২১ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশন। সাথে একটি ভিসিডি সেট।

দেয়ালে টাঙ্গানো বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরীদের ছবি। রুমের দু'পাশে সাজানো আছে সোফার সেট। তাতে একটি করে ছোট বালিশ। সোফার সামনে একটি টি-টেবিল। ফ্লোরে রেকসিন বিছানো।

মনির খান সোফায় বসে দু'টো সিগারেট টেনেছেন। এখন আরেকটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করছেন। এদিকে রাতের আগমনে চারদিক অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। রুমে টিউব লাইট জ্বালানো।

মেয়েকে নিয়ে ভাবছেন মনির খান। সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখনও মেয়েটি বাসায় ফেরেনি। কোথায় যায়, কি করে বলেও যায়নি। বুয়াকে কর্কশ স্বরে ডাকলেন, বুয়া।

মনির খানের ডাক শুনে বুয়া দৌঁড়ে আসল। বুয়া ভয়ে ভয়ে বলল, আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ। তোমাকেই ডাকছি। চোখ উপরে তুলে বলল, সোনিয়া গেছে কোথায়?

আমারে তো কিছু কইয়া যায় নাই সাব। কৈ গেছে তা বলতে পারি না।

ঠিক আছে যাও। আমি দেখছি।

বুয়া যখন যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় কলিংবেলের আওয়াজ মনির খানের কানে ভেসে আসল। এই তো সোনিয়া এসে গেছে দরজা খুল।

বুয়া দরজা খুলতেই সোনিয়া তার রুমে চলে যাচ্ছে। তাকে দেখে মনির খান যেন এতক্ষণে স্বস্তি ফিরে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন, সোনিয়া।

পিতার ডাকে সোনিয়া আচমকা দাঁড়ালো, ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আয় মা। বলেই মনিরখান সিগারেটে টান দিয়ে নাকে মুখে ধোঁয়া বের করে কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুন্যে উড়িয়ে দেয়।

সোনিয়া তার বাবার রুমে যেতে ইচ্ছে করছিল না। তবুও গেল। সে তাল গাছের মতো দাঁড়িয়ে মুখটা মলিন করে বলল, কেন ডেকেছ?

মনির খান সামনে সোফা দেখিয়ে বলল, বস্ মা। সোনিয়া ব্যস্ততার ভঙ্গিতে বলল, বসতে হবে না। কি বলবে বল।

মনির খান দৃঢ় গলায় বললেন, কি হয়েছে তোর? এমন করছিন কেন?

কিছু হয়নি।

কোথায় গিয়েছিলে?

তা জেনে তোমার লাভ কি?

মনির খান তো মেয়ের কথা শুনে আশ্চার্য। বাহ্‌রে! তুই আমার মেয়ে তুই কোথায় যাস। কি করছ? তা কি জানার অধিকার নেই?

নাহ্।

কেন?

কারণ তুমিতো আমার বাবা নও।

মনির খান অবাক হয়ে বলল, একি বলছিস তুই!

হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। তুমি যদি সত্যিই আমার বাবা হতে, তাহলে এভাবে নারীদের নিয়ে খেলা করতে পরতে না।

মেয়ের এ সমস্ত কথা শুনে লজ্জায় মনির খানের মাথা নিচু হয়ে গেল। যেন কিছু বলার মত ভাষা তার মুখে নেই। সমস্ত ভাষা যেন হারিয়ে যাচ্ছে তার মুখ থেকে। কিছুক্ষণ দু'জনে নীরব থাকার পর সোনিয়া কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, তোমার এই চরিত্রের জন্যে আমি আজ কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি না। কেন খোদা আমাকে তোমার ঔরসে জন্ম দিয়েছে? এই পাপের ফল একদিন তোমাকে ভোগ করতে হবে। আজ থেকে তুমি আমার বাবা নও। তুমি আর আমাকে মা বলে ডেকো না। একথা বলে দ্রুত সোনিয়া রুম থেকে বের হয়ে গেল।

সোনিয়া চলে যাচ্ছে। আর মনির খান হা করে মেয়ের পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন তিনি কিছুই বলতে পারলেন না।

সোনিয়া এ ধরনের নাটকীয় সংলাপ তার বাবার সাথে প্রায় প্রতিদিনই করে যাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিচ্ছেন। এতক্ষণে মনির খান কিন্তু সোনিয়ার তিরস্কারমূলক কথাগুলো ভুলে গেলেন। মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেলেন দুনিয়ার সব কিছু। একটি মদের বোতল টেনে নিলেন। মদ খেয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ে রইলেন বিছানায়।

এদিকে সোনিয়া তার পিতার কাছ থেকে এসে নিজের রুমে ধপাস করে শুয়ে পড়ে। এমন সময় বুয়া এসে বলল, আফা, ভাত খেয়ে যান।

সোনিয়ার চোখে জল। তাই আঁচল দিয়ে চোখ দু'টো মুছে বলল, আপনি যান আমি আসছি।

একথা বলাতে বুয়া চলে গেল। সোনিয়া বিছানা থেকে উঠে কাপড় পরির্বতন করল। শাড়ী পাল্টিয়ে সেলোয়ার কামিজ পড়ল। তারপর বাথরুমে যায়। বাথরুমের কাজ সমাপ্ত করে ডাইনিং রুমে যায়। তারপর একা ভাত খেয়ে নিল। মাতাল বাবাকে আর ডাকল না।

বুয়া গেল মনির খানের রুমে। সাহেব ভাত খেয়ে যান।

মাতাল মনির খান বিছানা থেকে উঠে হেলে দুলে বলল, কেরে আমার রুমে? চ ... চ চলে যা।

বুয়া দ্রুত বেগে মনির খানের রুম থেকে চলে আসে। কারণ কখন কি করে ফেলে বলা যায় না।

রাত আনুমানিক বারোটা বাজে। সোনিয়ার চোখে ঘুম নেই। বিছানার এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি করে ভাবছে, তার বাবার বর্তমান অবস্থার কথা। ভাবছে তার প্রিয়তম পুরুষ সাকিবকে নিয়ে। সে তার পরিবারের অবস্থার কথা সবই জানে। ভাবছে নিজের জীবনের কথা। এসব ভেবে ভেবে নীরবে কাঁদে। কোন ক্রমেই আজ দু'চোখের পাতা এক করতে পারছে না। তাই বিছানা ছেড়ে বারান্দায় আসল। রেলিং এ দাঁড়িয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছে। আজ পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় জলমল করছে সারা পৃথিবী। ঝিঁ ঝিঁ পোকা মিট মিট করে আলো দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শির শিরে হালকা নরম বাতাস এসে সোনিয়ার গাঁকে শীতল করে দিচ্ছে। এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না। তাই হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে আসল। ছাদে উঠে আনমনা ভাবে তাকিয়ে দেখছিল এত গভীর রাতেও যে ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে গাড়ী চলাচল করে। অনেকক্ষণ ছাদে থাকার পর আবার নিজের রুমে চলে আসে সোনিয়া। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই এক সময় নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

হারিছ ও রহিছ দু'ভাই। আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে হারিছ সাহেব তুলারামপুর জুটমিলে চাকরি করতেন। তাঁর চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এতই ভদ্র ছিলেন যে জুট মিলের সকল কর্মচারীরা তাকে শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন উক্ত মিলের ম্যানেজার। কিন্তু কতিপয় লোকেরা তাঁর এই ভালো আচরণ মেনে নিতে পারেনি। তারা অনেক চেষ্টা করেছে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে। কিন্তু যখন তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল তাকে মেরে ফেলবে। চাকরিতে যোগদান করার পর থেকেই হারিছ সাহেব তাঁর স্ত্রী আছিয়া বেগমকে নিয়ে জুট মিলের নিকটই বাসা ভাড়া করে থাকতেন। এরি মধ্যে চারটি বছর কেটে যায়।

আছিয়া বেগম ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আজ হারিছ সাহেব অন্যান্য দিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাসায় ফিরেন। রাত যখন আটটা বাজে তখন স্বামী স্ত্রী দু'জনে বসে তাদের অনাগত সন্তানের ভবিষ্যতের কথা নিয়ে ভাবছে।

হারছি সাহেব স্ত্রী আছিয়া বেগমকে বলল, আচ্ছা বলতো তুমি কি চাও? ছেলে নাকি মেয়ে?

আছিয়া বেগম বলল, আমি ছেলে চাই। আর তুমি কি চাও?

আমি মেয়ে চাই।

আচ্ছা ঠিক আছে দেখি কি হয়। যদি তোমার কথা মত মেয়ে হয় তাহলে নাম কি রাখবে?

রুবি।

সুন্দর নামতো। আচ্ছা আর যদি তোমার কথামত ছেলে হয় তাহলে নাম কি রাখবে?

সাকিব।

সন্তানের অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন তারা আলোচনায় মগ্ন তখন কয়েকজন লোক আসল। তাদের মধ্য থেকে একজন ডাকলেন, হারিছ সাহেব বাসায় আছেন?

তাদের ডাকে হারিছ সাহেব বাসা থেকে বের হলেন। তখন তার পরনে ছিল একটি লুঙ্গি ও শার্ট। লোকগুলো তাঁর কাছে অপরিচিত মনে হল। তবে এর মধ্যে তাঁর অফিসের একজন কর্মচারী আছেন তা তিনি ভালো করে চিনতে পারলেন। তখন ঐ কর্মচারী লোকটি বলল, স্যার আপনার সাথে কিছু কথা আছে এক জায়গায় যেতে হবে চলুন।

হারিছ সাহেব তার কথাই রাজি হয়ে আছিয়া বেগমকে বললেন, তুমি ঘরে থাক আমি আসতেছি। বলেই হারিছ সাহেব তাদের সাথে কথা বলতে বলতে এক নির্জন জায়গায় চলে আসলেন। এমন সময় হারিছ সাহেব বললেন, ঠিক আছে অফিসে কথা হবে আমি এখন চলে যাই।

তাদের মধ্য হতে একজন হারিছ সাহেবের হাত ধরে বলল, যা বলার এখন শুনে যান। আর বলার সময় পাবেন না। একথা বলেই তাঁকে টেনে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ।

তাদের এসব কথা ও টানাটানিতে হারিছ সাহেব একটু ভয় পেয়ে গেলেন। তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

অন্য একজন বলল, এইতো কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।

হারিছ সাহেব যত দূরে যাচ্ছে ততই ভয় পেয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপছে। কিছুদূর যেতেই দেখতে পেলেন দু'জন যুবক ছুরি হাতে দাঁড়ানো। এ দৃশ্য দেখে হারিছ সাহেবের গা ছম ছম করে উঠল। সমস্ত শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠল। হারিছ সাহেব ভয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, কি ব্যাপার তোমরা আমাকে কিসের জন্যে নিয়ে আসলে। কি উদ্দেশ্য তোমাদের?

কেন তোকে এখানে এনেছি তা এখনই দেখাচ্ছি। বলেই এক যুবক হারিছ সাহেবের মুখ চেপে ধরল। অন্য একজন রশি দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেলল। তিনি চীৎকার দেয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। আশে পাশে কোন লোক জন নেই যে তাকে কেউ সাহায্য করবে। গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তিনি তাদের কাছ থেকে ছুটতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। ধস্তাধস্তিতে একসময় মানুষ রূপী নরপশুগুলো হারিছ সাহেবকে কোরবানির পশুর মত মাটিতে শুয়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে পাষাণ নরপিচাশরা তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে দিল। রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল হারিছ সাহেবের সমস্ত শরীর। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। জবেহ করা গরুর মত ধাফরাতে লাগলেন। প্রাণ পাখিটা বের হয়ে গেল। মৃত্যু নিশ্চিত করে সন্ত্রাসীরা নির্বিঘ্নে চলে গেল।

এদিকে রাত দশটার উপরে বাজে। মরহুম হারিছ সাহেবের স্ত্রী আছিয়া বেগম স্বামীর চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। এখনও কেন তার স্বামী ঘরে ফিরছে না। কি হয়েছে ওনার? কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না আছিয়া বেগম। তার পেটে ছয় মাসের শিশু সন্তান। সন্তান নিয়ে কোথাও যেতে পারছে না। ভাড়া থাকেন বলে এখানে কোন আত্মীয় স্বজনও নেই। কার কাছে যাবে। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। চিন্তায় চিন্তায় নির্ঘুমভাবে সারারাত কাটিয়ে দিলেন আছিয়া বেগম। ফজরের আজান হল। অজু করে নামাজ আদায় করলেন। দু'হাত তুলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা

করলেন, হে আমার প্রভু, জানিনা আমার স্বামী কোথায় আছে। তুমি সব জান্তা। যেখানে থাকুক না কেন আমার স্বামীকে তুমি হেফাজতে রাখিও।

সকাল বেলা আছিয়া বেগম প্রতিবেশীদের সাথে তার স্বামী রাতে বাড়ি না ফেরার কথা বললেন। তার কথা শুনে সবাই তার খোঁজ নিচ্ছে তিনি কোথায় যেতে পারেন। সকাল আটটার দিকে হারিছ সাহেবের হত্যার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে আছিয়া বেগম হঠাৎ মেঝেতে পড়ে যান। চীৎকার দিয়ে বলল, হে খোদা তুমি একি করলে? কি অপরাধ ছিল আমার স্বামীর? যার কারণে আমাকে অল্প বয়সে বিধবা বানালে? কি কারণে তুমি আমার পেটের নিষ্পাপ সন্তানকে এতিম বানালে? তার চীৎকারে বাসার আশে পাশের লোকজন জড়ো হল। সবাই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে কিন্তু সে সান্ত্বনা কিছুতেই কাজে আসছে না।

পুলিশ এসে হারিছ সাহেবের লাশ ময়না তদন্তের জন্যে থানায় নিয়ে গেল।

গ্রামের বাড়িতে এ খবর শুনার সাথে সাথেই সবাই আহাজারিতে ফেঁটে পড়ল। বাবা চাঁন মিয়া, ছোট ভাই রহিছ মিয়া ঢাকায় আসে। লাশ ময়না তদন্তের পর যখন বাসায় নিয়ে আসল তখন সবাই রক্তাক্ত দেহের উপর পড়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। সাংবাদিকরা এসে লাশের ছবি তুলে নিল। পুলিশ আছিয়া বেগম ও চাঁন মিয়ার জবানবন্দি নিলেন।

পরদিন ছবিসহ পত্রিকাতে এ খবর ছাপা হল। সারাদেশের মানুষ এ সংবাদ জানল কিন্তু কেন খুন হল, কারা খুন করল তার হদিস পুলিশরা বের করতে পারেনি।

লাশ বাড়িতে আনা হল। হারিছ সাহেবের লাশ দেখার জন্যে গ্রামের মানুষের ঢল নেমেছে। এমনকি অন্য গ্রাম থেকেও মানুষ আসছে। আত্মীয় স্বজনরা সবাই আসল। লাশ নিয়ে যখন গোরস্থানে যাচ্ছে তখন চাঁন মিয়ার চোখ বেয়ে অশ্রু ধারা বইতে লাগল। এ কেমন দৃশ্য! পিতার কাঁধে ছেলের লাশ! এ দৃশ্য কোন বাবা কামনা করতে পারে না। এ শোক কিভাবে সইবে চাঁন মিয়া। সবাই লাশ দেখার পর দাফন করা হয়।

এদিকে রহিছ মিয়া সবে মাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র। তার ভাইয়ের হঠাৎ মৃত্যুতে সে খুবই মর্মাহত হলো। কারণ সংসারের সমস্ত বোঝা তার মাথায় নিতে হচ্ছে। তার বাবা-মা বৃদ্ধ। তার আর কোন ভাইও নেই যে, সংসারের দায়িত্ব নিবে। তাই ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে রহিছ মিয়া লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে দু'টো গরু কিনে কৃষি কাজে লেগে গেলেন।

চাঁন মিয়ার বড় আশা ছিল হারিছ মিয়া লেখাপড়া করে, চাকরি করে সংসারের স্বচ্ছলতা আনবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যায়।

হারিছ সাহেবের মৃত্যুর তিন মাস পর আছিয়া বেগম একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিলেন। পুত্র সন্তান জন্ম হওয়াতে চাঁন মিয়া খুবই খুঁশি হইছেন। কারণ তার ছেলের বংশধর তার মাধ্যমে বেঁচে থাকবে। আছিয়া বেগম তার সন্তানের নাম রাখলেন সাকিব।

মুসলিম আইনানুসারে স্বামী বিয়োগান্তে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী ইচ্ছে করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। আর ইচ্ছে না হলে বিধবাবস্থায় সারা জীবন থাকতে পারবে তাতে কোন পাপ হবে না। আর বর্তমানে সামাজিক ভাবে নিয়ম স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পূর্ণ হলে সে তার পিত্রালয়ে চলে যাবে এবং ইচ্ছে করলে অন্যত্র বিয়ে করবে নতুবা পিত্রালয়ে থাকবে। মৃত্যু স্বামীর বাড়িতে থাকার কোন অধিকার নেই। এখন সে অনুসারে আছিয়া বেগমকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সময় থেমে থাকেনি। দিনের পর রাত আসে। তারপরে সপ্তাহ পার হয়। এভাবে চলে যাচ্ছে মাসের পর মাস। দিনে দিনে বড় হতে লাগল সাকিব। সাকিবের দু'বছর পূর্ণ হল। এদিকে আছিয়া বেগম প্রাণের প্রিয়তম স্বামীকে হারিয়ে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে পিতৃতুল্য শ্বশুরের অনুরোধে এ বাড়িতে রয়ে গেলেন।

চাঁন মিয়া চিন্তায় অস্থির। তিনি ভাবেন, এভাবে আর কতদিন বউমা থাকবে। তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে ছেলে রহিছ মিয়াও তো বিয়ের উপযুক্ত। যে নারী কোন দিন শ্বশুরের মনে আঘাত দেয়নি, শশুরের একবিন্দু কষ্ট হতে দেয়নি। সেই নারীকে কীভাবে চাঁন মিয়া বিদায় দিবেন। এমন আদর্শ পরহেযগার সতী নারীকে কিছুতেই হাত ছাড়া করা যায় না। তাকে যেভাবে হোক এ বাড়িতে রাখতে হবে। হারিছ মিয়ার একমাত্র উত্তরাধিকারী শিশু সন্তান সাকিবকেই বা কি করে দিয়ে দিবেন। আর যদি নাতীকে রাখতে চান তাহলে কে করবে তার দেখা শুনা?

আবার এও ভাবছেন রহিছ মিয়া বর্তমানে বিয়ের উপযুক্ত। তাকে তো অন্য জায়গায় বিয়ে করাতে হবে। সে বউতো সাকিবকে অন্য নজরে দেখবে। তার চেয়ে বরং রহিছ মিয়াকে দিয়ে বউমাকে রেখে দিলে কেমন হয়? হ্যাঁ ভালোই হয়। এক ঢিলে দুই পাখি।

চাঁন মিয়া একদিন রহিছ মিয়াকে ডেকে বললেন, বাবা রহিছ, আমার বয়স তো ফুরিয়ে আসছে। জানি না কবে মরে যাই। তোকে আমার জীবনের শেষ একটি আবদার রাখতে হবে।

রহিছ নম্র স্বরে বলল, আব্বা আপনার সব আবদার আমি শুনে আসছি। আজও শুনব। বলেন আপনার কি আবদার।
চাঁন মিয়া গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমি চাই তুই তোর ভাবিকে বিয়ে কর। ও যদি চলে যায় তাহলে তোর ভাতিজার কি হবে? সে কাকে মা ডাকবে? সে জন্ম হয়ে তার বাপকে দেখেনি। এখন যদি মাকেও হারাতে হয় তাহলে তার মত অভাগা পৃথিবীতে আর নেই। হারিছের অবর্তমানে তুই ওর বাপ। আমার আয়ু তো শেষ হয়ে আসছে। আমি হয়তো আর বেশি দিন বাঁচব না।
পিতৃভক্ত রহিছ কোন দিন কোন কাজে তার বাবার মনে আঘাত দেয়নি। আজ পর্যন্ত কোন কথা অমান্য করেনি। কি করে পারবে আজ বাবার শেষ আবদার ফেলে দিতে। শত কষ্ট হলেও পারবে না তার বাবার আবদারকে অপমান করতে।
চাঁন মিয়া আবার বলল, আমি জানি বাবা, বউমার চেয়ে তোর বয়স কম হবে। তারপরও সবদিক চিন্তা ভাবনা করে আমি তোকে বিয়ে করতে বলছি। তুই তো জানিস আমাদের মহানবী (সা:) এর ইতিহাস। তিনি যখন বিয়ে করেন তখন খাদিজা (রা:) এর বয়স ছিল ৪০ বছর। আর রসুল (সা:) এর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। দু'জনের মধ্যে ১৫ বছরের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদিজা (রা:) কে বিয়ে করেছিলেন। তিনি নবী হয়ে যদি পারেন, তাহলে তুই কেন পারবি না? আমি জানি বউমার বয়স বেশি হলেও তেমন বেশি না। চার পাঁচ বছরের পার্থক্য হবে।
রহিছ মিয়া তার বাবার কথাগুলো শ্রবণ করে চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখেন আব্বা এত কিছু বলতে হবে না। আপনি যা ভালো মনে করেন তা করেন। এতে আমার কোন আপত্তি নেই।
পরে চাঁন মিয়া একই ভাবে আছিয়া বেগমের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করেন। আছিয়া বেগম শুধু ছেলে ও শশুরের দিকে চেয়ে সম্মতি দেয়।
বিয়ে হয়ে গেল রহিছ মিয়ার সাথে আছিয়া বেগমের। এ ধরনের বিয়েকে সামাজবিজ্ঞানের ভাষায় লেভিরেট বিয়ে বলা হয়। এটা আমাদের মুসলিম আইনে বৈধ। কিন্তু তারপরও স্বামী মারা যাবার পর বিধবা স্ত্রীকে দেবর বিয়ে করে এর প্রচলন খুবই কম। লাখে একজন আছে কিনা সন্দেহ। কারণ কেউ তার ফুটন্ত যৌবনকে বিধবা স্ত্রীর মাঝে বিলিয়ে দিতে চায় না। কিন্তু সেই দৃষ্টান্তই স্থাপন করলেন রহিছ মিয়া। তাঁর বাবার কথা রাখতে গিয়ে, তার ভাতিজাকে মা ডাকার অধিকার দিতে গিয়ে, সদ্য ফুটে উঠা যৌবন খানা বিলিয়ে দিলেন তার চেয়ে বয়সে বড় একটা মহিলার মাঝে। যাকে সে এতদিন ভাবি হিসেবে জানত। আজ সে তার স্ত্রী। মহৎ মনের অধিকারী রহিছ মিয়া আজ বাসর রাতে প্রতিজ্ঞা করেন

ভাতিজা সাকিবকে লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁর ভাইয়ের মত একজন সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

ভাই মারা যাবার পর রহিছ মিয়ার সংসারে অভাব শুরু হয়ে গেল। বাবা চাঁন মিয়া বয়সের ভারে দিন দিন বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। এখন তেমন বেশি চলাফেরা করতে পারে না। শুধু মসজিদ ছাড়া আর কোথাও যেতে পারেন না। তার মা কিছুদিন আগে মারা যায়।

দেখতে দেখতে দু'বছর পার হয়ে গেল। রহিছ মিয়ার সংসারে একটা কন্যা সন্তান হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেই সন্তান দুনিয়াতে বেশিদিন থাকতে পারেনি। হঠাৎ একদিন ডায়রিয়া হয়ে মারা যায়। দিন মজুর রহিছ তার সন্তানের সু-চিকিৎসা করতে পারেনি। সন্তান হারিয়ে বুকে ব্যথা নিয়ে সাকিবকে সন্তানের মত করে লালন পালন করতে লাগলেন। নিজে একা পরিশ্রম করেন তবু সাকিবকে কাজে নেননি। ও যখন ৬ বছরে পদার্পন করল তখন তাকে গায়ের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

রহিছ মিয়ার মেয়ের জন্মের তিন বছর পর একটা পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তার নাম রাখেন বাবুল। যে দিন বাবুলের জন্ম হল সেদিন রহিছ মিয়ার ঘরে এক মুঠো ভাতও ছিল না। বাবুল জন্মের পর থেকে রহিছ মিয়ার সংসারে অভাব বেশি করে দেখা দেয়। যা কিছু জমি জমা ছিল তাও বিক্রি করে শেষ করে ফেলল। এই অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে বাবুল বড় হতে লাগল। এখন রহিছ মিয়ার নিজের জমি বলতে কিছুই নেই। বর্তমানে দু'টো গরু দিয়ে মানুষের জমিতে বর্গা চাষ করে কোন মতে দিন চলছে। এই অভাবের সংসারে বাবুলকে লেখাপড়া করানোর সামর্থ হারিয়ে ফেলেন।

রহিছ মিয়া বাবুলকে একটা ছাগল কিনে দিলেন। তাদের গ্রামের উত্তর পাশে এক বিরাট চর। তার কাজ এই চরে গরু দু'টো ও ছাগলকে ঘাস খাওয়ানো। আর মাঝে মাঝে বাপের সাথে খেত নিড়াইতে যায়। এই অভাবের পরও রহিছ মিয়া কিন্তু তার ভাতিজা সাকিবের লেখাপড়া বন্ধ করেননি। এই দুনিয়াতে কয় জন ব্যক্তি আছেন যে নিজের ছেলেকে না পড়িয়ে ভাতিজাকে পড়ায়। অথচ তার লেখাপড়া করানোর সামর্থ নেই। ঈদ এলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভাতিজার লেখাপড়ার খরচ যোগানোর জন্যে ফেতরার টাকা তুলতে হয়। এত পরিশ্রম ও এত কষ্ট করছেন তারপরও তার মধ্যে বিন্দু মাত্র দুঃখ নেই। তিনি মনে করেন তার ভাই এখনো বেঁচে আছেন। কারণ সাকিব দেখতে ঠিক তার ভাইয়ের মতই হয়েছে।

সাকিব এস.এস.সি পাশ করল। একদিন পারিবারিক বিষয় নিয়ে সাকিব চাচার সাথে ঝগড়া করে ঢাকায় চলে যায়। সেই থেকে আজ চার বছর গত হল। আজ পর্যন্ত বাড়ির সাথে যোগাযোগ করেনি। সে যেদিন বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসে,

তখন সে বলে আসে যেদিন সে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, সে দিন সে বাড়ি ফিরবে।

ঢাকায় এসে এক কলেজে ভর্তি হয়। বর্তমানে বি.এস.সি শেষবর্ষে অধ্যায়নরত। কলেজে পরিচয় হয় সোনিয়ার সাথে। আজ দুই বছর যাবৎ সে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

পিতৃহারা সন্তান সাকিবকে হারিয়ে আছিয়া বেগম এখন দিশেহারা। তার কান্না সহ্য করতে না পেরে রহিছ মিয়া কয়েকবার ঢাকায় এসে সাকিবকে খুঁজে যায়। এত বড় শহর কোথায় পাবে তাকে। তাদের তো কোন আত্মীয় স্বজনের বাসাও নেই যে সেখানে যাবে। কোথাও তাকে খুঁজে না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় রহিছ মিয়া। প্রাণ প্রিয় সাবেক স্বামীর মৃত্যুর শোক ভুলতে না ভুলতেই ছেলে আবার নিরুদ্দেশ। ছেলে তো তার মায়ের ব্যথা বুঝল না। যদি বুঝত তাহলে এমন নিষ্ঠুরের মত মাকে ছেড়ে থাকতে পারত না।

একটি পুরুষ যখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় তখন মা-বাবার কথাও মনে থাকে না। বিশেষ করে যারা দুরে থাকে। আর এখন সাকিবতো তার প্রাণের প্রিয়তমা সোনিয়াকে পেয়ে মা, চাচা, দাদা ও ভাইয়ের কথা ভুলেও মনে করে না। রহিছ মিয়া এখন খুব কষ্টে দিন যাপন করছে। কখনো দু'বেলা খেয়ে রাত কাটাতে হচ্ছে। সামান্য একটা ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আজ ভাতিজা তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

রহিছ মিয়ার মাঝে মাঝে ভাতিজার কথা মনে হলে ভাবেন, নিজের সন্তানকে লেখাপড়া না শিখিয়ে, নিজে না খেয়ে, ফেতরার টাকা তুলে লেখাপড়ার খরচ যুগিয়েছি। অথচ মানুষ একদিন বলেছিল, কি লাভ হবে ভাতিজাকে পড়িয়ে? সে তো একদিন তার পথ ধরবে। কিন্তু আমি তো গর্ব করে বলেছিলাম, না আমার ভাতিজা এমন হবে না। কিন্তু সে গর্ব আর এখন নেই। মানুষ আজ তাকে ধিক্কার দেয়। আজ যেন মানুষের কথাই সত্যে পরিণত হল। অথচ সাকিব বুঝল না তার পিতৃতুল্য চাচার কথা। যার কারণে সে মাকে পেল সেই চাচাকে চিনল না।

সাকিব তেজকুনিপাড়ায় বাসা করে থাকে। টিউশনি করে বাসা ভাড়া ও খাওয়া খরচ চালায়। কারণ তারতো বাড়ি থেকে টাকা আসার কোন পথ নেই। তবে সোনিয়াও মাঝে মাঝে তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে। বর্তমানে সাকিব বি.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছে। কয়েক মাস পরে রেজাল্ট দিবে। সাকিব বুয়া দিয়ে পাক করিয়ে খেত। সোনিয়ার সাথে যখন পরিচয় হয় তখন থেকে সোনিয়া তাকে বুয়া দিয়ে পাক করিয়ে খেতে দেয়নি। কারণ সোনিয়া প্রতিদিন তাকে রান্না করে দিয়ে যায়। সোনিয়ার এমন গভীর ভালোবাসায় সাকিব এমনই পাগল হয়েছে যে, তাকে ছাড়া এখন আর কিছুই ভালো লাগে না। একদিন সোনিয়ার সাথে কথা না হলে মনে হয় হাজার বছর ধরে কথা হয়নি। সোনিয়া যখন রান্না করে তখন সাকিব বসে থাকে যতক্ষণ না তার রান্না শেষ না হয়। মনে হয় তারা স্বামী-স্ত্রী। এভাবেই তাদের প্রতিটি দিন অতিবাহিত হয়। তাদের এ প্রেম কাহিনী বাসার আশেপাশের সবাই জানে। কেউ তাদের ভালোবাসায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

শীতের সকাল। শবেমাত্র শহরের মানুষগুলো ঘুম থেকে জেগেছে। কেউ কেউ এখনো ঘুম থেকে উঠেনি। কারণ বর্তমানে টিভি চ্যানেলগুলোতো সারারাত খোলা থাকে। তাই টিভি দেখে এত রাতে শুয়ে সকালে উঠতে শহরের মানুষের ৮/১০টা বেজে যায়। আজ থেকে দশ বছর পূর্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, তখন কিন্তু এত টিভি চ্যানেল ছিল না। আর গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলো এশার নামাজ পড়েই ঘুমিয়ে পড়তো। আর ভোর পাঁচটার আগেই ঘুম থেকে জেগে উঠতো।

সোনিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আড়মোড়া দিয়ে সোনিয়া বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে গেল। বুকের দিকে চোখ পড়তেই লজ্জায় চোখ উপরে তুলে বলল, তোকে শুধু সাকিবের জন্যে যত্ন করে রেখেছি। কেউ এ বুকে হাত দিতে পারবে না। না! আর দেরি করা যাবে না। সাকিবের কাছে যেতে হবে। ওকে নিয়ে আজ ঘুরব। পার্কে যাব। কত মজা হবে তাই না! এসব বলতে বলতে সাওয়ার ছেড়ে দিল। ঝটপট গোসল সেরে ফেলল। বাথরুম থেকে তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে মুছতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে আসলো। চুলগুলো সুন্দর করে আচরিয়ে সিঁথি করল। গলায় স্বর্ণের একটা চেইন পড়লো। তার প্রিয় আকাশি রঙের শাড়িটা পড়লো। তার সাথে ম্যাচ করে ব্লাউজ পড়লো। ঠোঁটে লাল রঙের লিপস্টিক দিল। কপালে ছোট করে একটা টিপ দিল। বাহ! বেশ সুন্দর লাগছে তো। রূপচর্চা শেষে বুয়াকে বলল, দিদি।

বুয়া ডাক শুনে দ্রুত এসে বলল, আফা আমারে ডাকছেন?
হ্যাঁ।
আর শুনুন দিদি, বাবা ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞেস করলে বলবেন। আমি আজ আমার এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছি। আসতে সন্ধ্যা হবে। ঠিক আছে।
আচ্ছা আফা।
সোনিয়া সাকিবের বাসার দিকে রওনা দিল। সে সাকিবের বাসায় এসে দেখে সাকিব এখনো ঘুম থেকে উঠেনি। দরজায় নক করতেই সাকিব দরজা খুলল। সোনিয়াকে দেখে সাকিব আশ্চার্য হয়ে বলল, সোনিয়া! এত সকালে তুমি?
সোনিয়া ঠাণ্ডা মাথায় বলল, হ্যাঁ আজ সকাল বেলা আসলাম। কারণ তোমাকে নিয়ে আজ আমি বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাব।
তাহলে আমার টিউশনি।
সোনিয়া ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলল, আজ আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। তোমার সব টিউশনি আজ আমি ছুটি ঘোষণা করলাম।
ঠিক আছে। কি আর করা। যেন খুব কষ্ট হয়েছে একথাটা বলতে সাকিবের।
সোনিয়া খাটে বসে বলল, তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হও।
সাকিব তার গালে হাত দেখিয়ে বলল, একটু বস আমি সেভটা করে নেই।
সোনিয়া সেভ করার কথা শুনেই দরজাটা লাগিয়ে দিল।
আরে দরজা দিচ্ছ কেন? অন্ধকার হলে সেভ করব কিভাবে?
বাতি আছে না।
তাই বলে দরজা দিতে হবে?
কেন দরজা দিলাম তা এখনই দেখাচ্ছি। বলেই সোনিয়া বলল, এবার সাহেব আপনার লেজার, ক্রীম, ব্রাশ এগুলো আমার কাছে দিন।
সাকিব সোনিয়ার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে রহস্য করার জন্যে বলল, তুমি এগুলো দিয়ে কি করবে? তোমার তো কোন দাড়ি-গোফ নেই।
সোনিয়া চোখ রাঙিয়ে বলল, টিটকারি না করে আমার হাতে দাও বলছি।
সাকিব বাধ্য প্রেমিকের মত লেজারটা তার হাতে তুলে দিল।
সোনিয়া এবার তার সামনে বসে বলল, আজ আমি তোমাকে সেভ করে দিব। তুমি কিছু বলতে পারবে না।
আহ্হা। সাকিব বিরক্তি বোধ করল।
এই তুমি এমন করছ কেন?
না বলছিলাম কি, আমি তো পারব।
আচ্ছা, আমি তোমার কে?
প্রেমিকা। প্রাণের প্রিয়তমা।

না তুমি ভুল বলেছ। আমি হচ্ছি তোমার হবু স্ত্রী। অতএব আমার কাজ আমাকে করতে দাও। এই বলে সোনিয়া সাকিবের গালে, থুতনিতে ক্রিম মাখল।
সাকিব তাকে একটু খেপানোর জন্যে বলল, এই তুমি আবার নাপিতনী হলে কবে থেকে?
এই ধর আজ থেকেই।
তাহলে নাপিতনী তোমাকে কত দিতে হবে?
আমাকে কোন টাকা দিতে হবে না।
তা হলে কি দিতে হবে।
ভালোবাসা।
ভালোবাসা! বড় অদ্ভুত নাপিতিনী তুমি। আমি জীবনেও এমন নাপিতিনী দেখিনি।
এই বেশি কথা বলবেনা। তাহলে কিন্তু গাল কেটে ফেলব।
এ্যা! গাল কেটে ফেলবে! তাহলে চুমু দিবে কোথায়?
কেন? তোমার ঠোঁটে। বলেই আবার বলল, হয়েছে আর ফাজলামো করতে হবে না। এভাবে বকবক করলে সত্যি সত্যি কিন্তু গাল কেটে যাবে। তখন কিন্তু তোমার চেয়ে বেশি কষ্ট পাব আমি। কারণ তোমার সব কিছুইতো আমার।
সাকিব আর কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। আর সোনিয়া অভিজ্ঞ নাপিতিনীর মত ধীরে ধীরে সাকিবকে সেভ করে দিল। সাকিব এবার বাথরুমে গিয়ে গোসল সেরে নিল। গোসল করে দু'জন পাশাপাশি বসল।
সোনিয়া সাকিবকে লক্ষ্য করে আদেশের সুরে বলল, আজ থেকে আর সেলুনে সেভ হবে না। আমি তোমাকে সেভ করিয়ে দিব। সেলুনে সেভ করলে অনেক ক্ষতি হয়। এক ব্লেট দিয়ে তারা একাধিক লোকের দাড়ি সেভ করে। ব্লেটের সাথে একজনের জীবাণু অন্য জনের শরীরে প্রবেশ করে।
সাকিব কিছু বলার আগেই সোনিয়া প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, আর শোন আল্লাহ চাহেতো যদি পাশ করতে পার তাহলে একটা চাকরির ব্যবস্থা করবে। আর চাকরি হয়ে গেলেই তোমার ঘরণী হব। তখন সারাক্ষণ তোমার পাশে থাকব। তোমার সেবা যত্ন করব। তোমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরব। তখন আমাকে হারানোর আর ভয় থাকবে না।
সাকিব এসব কথা শুনেই যাচ্ছে কিন্তু কিছুই বলছে না। এবার সে মুখ খুলে মুখে হাসির রেখা অঙ্কন করে বলল, তাহলেতো আজই চাকরির সন্ধানে বের হতে হবে।
আরে এত তাড়াহুড়া করতে নেই। আগে রেজাল্ট বের হোক তারপর। আর আমিতো এখনই তোমার গলায় ঝুলিয়ে পড়ছি না। একথা বলেই সোনিয়া ঘড়ির

দিকে তাকিয়ে বলল, এই তাড়াতাড়ি প্যান্ট শার্ট পড়। দেখতে দেখতে তো নয়টা বেজে গেল।
এবার সাকিব প্রিয়তমার প্রাণে তাকিয়ে বলল, মহারাণী কোথায় যেতে হবে?
আজ সোনিয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যাবে। একথা জেনেও ইতরামি করার জন্যে বললো।
আমি যেখানে যাব সেখানে যাবে।
তুমি কোথায় যাবে?
সোনিয়া রহস্য করে বলল, জাহান্নামের চৌরাস্তায়।
ওখানে গেলে কি হবে।
ওখানে গেলেই বুঝতে পারবে।
সাকিব যেন বিরক্তির সুরে বলল, আহ্হা বল না কোথায় যাবে?।
সোনিয়া সাকিবের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, এই তুমি এত বোকা কেন?
কেন? কি হয়েছে?
কোথাও যাবার কথা বললেই তুমি সংকোচ মনে কর।
এসব কথা বলতে বলতে সাকিব প্যান্ট পড়ে নিল। এবার সাকিব আয়নার সামনে দাঁড়ালো। ভালো করে চেহারা দেখে নিল। এদিকে সোনিয়া তার বরাবর পেছনে দাঁড়ালো। দু'জনকেই আয়নায় দেখা গেল। সোনিয়া আস্তে আস্তে সাকিবের গালে তার ডান হাতটা রাখল। সদ্য সেভ হওয়া গাল। আহ্! কি মসৃণ। সাকিব শার্টের কালার ঠিক করতে করতে তার হাতটা সরিয়ে নিল। তার হাত সরিয়ে নিতে দেখে সোনিয়া বলল, এই তুমি কি আমার মনের কথা বুঝনা, আমি কি চাচ্ছি? এ কথা বলে সোনিয়া তার দু'হাত সাকিবের দু'বাহু ধরে তার দিকে ফিরিয়ে তার হাতে নিজের গালটি দেখিয়ে বলল, এখানে একটা...প্লিজ।
সাকিবও চাচ্ছিল ওকে আজ একটা চুমো দিবে কিন্তু সোনিয়া কি জানি কি বলে তাই দিতে চাইল না। এখন যখন সোনিয়া নিজেই বলছে তখন আর দেরি কিসের। সাকিব সোনিয়ার দু'কান বরাবর মাথাটাকে চেপে ধরে গালটাকে তার কাছে আনল। দু'হাত বগলের পিছন দিয়ে প্রবেশ করিয়ে পিঠে হাত ভুলাতে লাগল। সাকিবের স্পর্শে সোনিয়া শিহরিত হয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে সাকিব তার মুখটাকে গুল করে সুন্দর করে তার গালে একটা ভালোবাসার চুমো এঁকে দিল। মূহুর্তের মধ্যে যেন তারা আজ ভালোবাসার অতল গহরে হারিয়ে গেল। এই চুমোর জন্যেই হয়তো সোনিয়া ঊনিশটি বসন্ত পার করে আসছে। আজ যেন স্বর্গের সুখ পেল ও। ভালোবাসায় এত সুখ তা আগে জানত না।
আর বিলম্ব না করে বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। বাসে দু'জনে পাশাপাশ সিটে বসলো। প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে মিরপুর

বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে পৌঁছল তা টেরও পায়নি তারা। বাস থেকে নেমে এবার টিকেট কাটল। বাগানের ভেতর প্রবেশ করতেই দু'জনে হাত ধরাধরি করে হাঁটাতে লাগল। এই গার্ডেন ছোট বড় সবার জন্যে উন্মুক্ত। তবে শিশু-কিশোরদের চেয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা ও দম্পতিরা এখানে বেশি আসে। বাংলাদেশীদের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকরাও আসে। সারাদিনই নারী পুরুষে ভরপুর থাকে এ গার্ডেন। গার্ডেনের গাছপালার সাথে যেন মানুষ মিশে একাকার হয়ে যায়। সাকিব ও সোনিয়ার মত কত প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল এখানে আসে তা গুনে শেষ করা যাবে না।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে পদ্মপুকুর পাড়ে চলে আসল। সেখানে দূর্বাঘাস দেখে বসে পড়ল দু'জনে। সাকিব সোনিয়াকে কোলে নিয়ে বসল। ওর দু'টি হাতে সোনিয়ার বুক ঝাপটে ধরল। কিছুক্ষণ নীরবতা থাকার পর সাকিব বলল, এই শোন।

সোনিয়া ঘাড় ফিরিয়ে সাকিবের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ বল।

আর কতদিন আমাদেরকে এভাবে পথ চলতে হবে?

যতদিন চালানো যায়।

যতদিন চালানো যায় মানে। এভাবে কি আমাদের জীবন চলবে?

তাহলে কি করতে হবে?

সংসার পাততে হবে না?

সংসার কি বললেই পাতা যায়। তাছাড়া তোমার একটা চাকরি না হলেতো সংসার পাতা যাবে না।

তা অবশ্যই ঠিক।

এবার সাকিব প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, আচ্ছা সোনিয়া তোমার বাবা আমাদের এ সম্পর্ক মেনে নিবেতো?

দেখ বাবার ব্যাপারে কিছু বলবে না। ওনি মেনে নেক বা না নেক তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমি তার একমাত্র মেয়ে। আমার মতের বিরুদ্ধে করলে সোজা তোমার কাছে চলে আসব।

চলে আসলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে?

সোনিয়ার দু'চোখ খানা তার দিকে তুলে বলল, হ্যাঁ সমাধান হবে।

কীভাবে?

সোনিয়া নরম গলায় বলল, শোন মেয়েদের জন্মই হয় স্বামীর ঘরে চলে যাবার জন্যে। আমি আমার বাবার সাথে চিরদিন থাকব না। স্বেচ্ছায় তোমার কাছে দিলে চলে আসব, না দিলেও চলে আসব। কারণ বিয়ের পর নারীর স্বামীই সব কিছু। এখন কথা হচ্ছে আমার বাড়িতে তুমি থাকবে না, তোমার বাড়িতে আমি

থাকব। তোমার চাচা, মা আমাদের এ সম্পর্ক মেনে নিবে কিনা সেটা চিন্তা কর। আমার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না।
সোনিয়ার কথা শুনে সাকিবের যেন এবার টনক নড়ল। তা তো ঠিকই বলছ। এমন করে তো কখনো ভেবে দেখিনি। চাচা, মা তাদের সাথে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে আসছি, আজ চার বছর গত হয়েছে। এখন কীভাবে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। আর তোমার কথাই বা কি করে বলবো। চাচা যা না করবে তাই হবে।
সোনিয়া তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, তাহলে কি হবে?
আরে এত চিন্তা করো না। বাড়িতে জায়গা না পেলে কি বাংলাদেশে জায়গা পাব না।
আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আর এ ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না। এখন কথা হচ্ছে ...। হঠাৎ করে তার মনে পড়ল তার ছোট ভাইটির কথা। এই তোমার ছোট ভাইটির নাম যেন কি?
বাবুল।
ওকে না, দেখতে খুব ইচ্ছে করে।
কিন্তু কীভাবে তোমাকে দেখাব। ওর ছবিও তো আমার কাছে নেই।
এই তোমার ছোট ভাই কি দেখতে তোমার মতই?
হ্যাঁ কিছুটা মিল আছে আমার সাথে।
এভাবে কিছুক্ষণ পর পর প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বিভিন্ন কথা বলতে বলতে দুপুর দু'টো বেজে গেল। সূর্য এখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ল। গার্ডেনের অসংখ্য গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে।
একটি মেয়ে কতগুলো বকুল ফুলের মালা নিয়ে আসল। মেয়েটির পরনে একটি ময়লা জামা ও একটি হাফপ্যান্ট। আজ সে অসহায় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছে বিধায়, যে বয়সে লেখাপড়ার কথা ছিল সে বয়সে মালা বিক্রি করে পেট চালাচ্ছে। মেয়েটি অসহায় দৃষ্টিতে ডান হাতে একটি মালা নিয়ে সাকিবের সামনে ধরে বলল, ভাইজান মালা নিবেন, মালা। দুই ট্যাহা দাম। নেন না একটা মালা। আফারে খুব মানাবে।
একথা শুনে সোনিয়া হেসে উঠল। মেয়েটি আবার বলল, হাসবেন না আফা। সত্যি আপনারে মানাবে। আর আফনারা যদি আমাগর কাছ থিকা না নেন তাহলে আমডা খামু কি? মা কইছে, চুরি করা মহাপাপ। তাই চুরি করি না। ভিক্ষাও করা ভালো না। তাই মালা বেইচ্যা ভাত খাই।
এতটুকুন মেয়ের এ সমস্ত মিনতি মাখা কথা শুনে সাকিব ভাবতে লাগল এত ছোট মেয়ে অথচ কত সুন্দর করে কথা বলে। মেয়েটির প্রতি তার মায়া হল।

সাকিব তাকে বলল, তোমার এখানে মালা কয়টি?
মেয়েটি গুণে বলল, ভাইজান দশটা।
সবগুলো মালা আমার কাছে দাও।
মেয়েটি সবগুলো মালা সাকিবের হাতে দিল। সাকিব সবগুলো মালা সোনিয়ার গলায় ও খোঁপায় পড়িয়ে দিল। বাহ! গার্ডেনের প্রকৃতি পরিবেশে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে সোনিয়াকে। এবার সাকিব মানিব্যাগ থেকে একটা বিশ টাকার নোট বের করে মেয়েটির হাতে দিল। মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, এমন সময় সাকিব বলল, শোন। মেয়েটি কাছে আসতেই বলল, তোমার নাম কি?
মেয়েটি বলল, বকুল। জানেন ভাইজান, আমার মা আমার নাম কেনে বকুল রাখছে?
কেন?
আমি খুব বকুল ফুল পছন্দ করি তাই বড় হইছি পরে আমার মা আমার নাম বকুল রাখে। এই জন্যেতো আমি আপনাগো লাগি বকুল ফুল তোলে মালা বানাইয়া আনি।
সোনিয়া এবার জিজ্ঞেস করল, তোমার মা, বাবা নেই?
একথা বলতেই বকুলের দু'চোখে পানি এসে গেল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, না আফা। আজ থাইকা দুই বছর আগে আমার বাবা মারা গেছে। আর মা আছে। আমি ফুল বেছে যা পাই তা দিয়ে আমডা চলি।
তোমার বাবা কীভাবে মারা গেছে?
গাড়ির তলে চাপা পইড়া।
মেয়েটির দুঃখ দেখে সোনিয়ার খুব মায়া হল। সে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে বলল, এই নাও, এই টাকা দিয়ে তোমার মায়ের জন্যে ভালো খাবার কিনে নিবে।
বকুল টাকা দেখে বলতে লাগল, না আফা না, ট্যাহা লাগব না। আমি ভিক্ষা নেই না।
বকুলের কথা শুনে সোনিয়া ও সাকিব আশ্চার্য হয়ে গেল। এটা ভিক্ষা নয় তোমাকে উপহার দিলাম।
সোনিয়া বারবার দেওয়ার পরও সে টাকাটা নিচ্ছে না। এক সময় জোর করে তাকে টাকাটা দিয়ে দিল। মেয়েটি সালাম জানিয়ে চলে গেল। হকারকে ডেকে কোকাকলা, কেক, কলা আনল। দু'জনে মিলে খেয়ে নিল। এদিকে সূর্য মামা তার ত্যাজ হারিয়ে কমতে লাগল। আর তখই তাড়াতাড়ি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

হেমন্তের শিশির ঝরা দিনগুলোর ভেতর দিয়ে ঘন কুয়াশার চাদরমুড়ি দিয়ে আবির্ভাব হয়েছে শীতকাল। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের শীতটা যেন একটু বেশি। হাঁড়কাপানো শীত। প্রকৃতি এখন তার সমস্ত আবরণ খুলে জীবনের চাঞ্চল্যকে অম্লান করে দিয়েছে। গাছপালাগুলো থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো এখনও যেন টুপটাপ করে একের পর এক পাতা ঝরছে। যেন গাছগুলো অলংকার শূন্য বিধবা হয়ে যাচ্ছে।

সকাল বেলা কুয়াশাকে ভেদ করে সূর্য মামা বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে উকি মারছে। মনে হয় যেন সূর্য দেখা করতে আজ খুব লজ্জা পাচ্ছে। সূর্যের আলো দুর্বা ঘাসে পড়তেই মুক্তার মত ঝলমল হয়ে উঠেছে। এমনই শীতের সকাল খুবই উপভোগ্য। কিন্তু যারা গরিব, মিসকিন, যাদের ঘরের দু'বেলা দু'মোঠো ভাত জুটে না তাদের জন্যে কি এমন শীত উপভোগ্য? নিশ্চয় নয়। কারণ তাদের তো শীতের কাপড় কেনার মত তৌফিক নেই।

রহিছ মিয়ার আজ সেই অবস্থা। আজকের শীতটা যেন রহিছ মিয়ার জন্যে মরণ ডেকে আনছে। কারণ সে তো আর কোটিপতি নয় যে কম্বল গা দিয়ে থাকবে। তার তো 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।'

আজ রহিছ মিয়ার ঘরে কোন খাবার নেই। গত সপ্তাহে অসুস্থতার কারণে কোন কাজ করতে পারেনি। তাই হাতে টাকা পয়সাও নেই যে বাজার করে খাবে। সকালে আছিয়া বেগম প্রতিবেশির ঘর থেকে কিছু আটা এনে রুটি বানাল। আছিয়া বেগম যখন রুটি বানাচ্ছিলেন তখন বাবুল পিঁড়ি নিয়ে চুলোর পাশে এসে বসল। রহিছ মিয়া চুলোর পাশে বসে আছে। বাবুল অশ্রুসজল চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, মাগো, ভাইয়া কি আর আসবে না।

আছিয়া বেগম ছেলের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয় বলল, আসবে বাবা।

কবে আইব মা?

এই কিছু দিন পরে আসবে।

অবুঝ বাবুল আবার বলে, মা ভাইয়া আমার জন্যে কি নিয়ে আসবে?

এভাবে একের পর এক আছিয়া বেগমকে প্রশ্ন করেই যাচ্ছে, কিন্তু আছিয়া বেগম ছেলের সব উত্তর দিতে পারছে না। শুধু মিথ্যে সান্ত্বনা দেয় ছেলেকে।

আছিয়া বেগম রুটি বানিয়ে ছেলে ও স্বামীকে দিলেন। রুটি ঠিকই দিলেন কিন্তু তরকারির ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তরকারি ছাড়া রুটি খেতে বাবুলের কাছে ভালো লাগছে না। এমনিতে আবার লাল আটা।

একটা রুটির টুকরা মুখে দিয়ে বাবুল রহিছ মিয়াকে বলল, বাবা আমরা গরিব কেন? করিমের বাবা কি বড় লোক! জান বাবা করিমের বাবা প্রত্যেক দিন মাছ আনে, গোস খায়, দুধ খায়। আপনি এগুলো আনতে পারেন না?

রহিছ মিয়া যেন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না। তার চোখ দু'টো জলে টলমল করছে। আছিয়া বেগমের চোখেও পানি জমে গেল। রহিছ মিয়া মনে মনে বলেন, হে খোদা তুমি কেন আমাকে এভাবে গরিব করে দুনিয়ায় পাঠাইছ? ভাতিজাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম। ভাবছিলাম ওকে দিয়ে বুঝি আমার সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে। কিন্তু ও আমাকে বুঝল না। একি আমার অপরাধ ছিল? আজ কেন স্ত্রী, ছেলেকে দু'মোঠো শাক ভাত খাওয়াতে পারি না? কেন আজ ছেলের প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না।

বাবুল দু'জনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, একি! আম্মা, আব্বা আপনারা কাঁদছেন কেন?

রহিছ মিয়া ছেলের কথায় চেতনা ফিরে পেলেন। হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে ছেলের পিঠে হাত রেখে বললেন, দেখ বাবা আমরা একদিন অনেক বড় লোক হব।

করিমের বাবার চেয়েও কি বড় লোক হবে।

হ্যাঁ।

নাও এখন খেয়ে নাও।

পরদিন সকাল বেলা। দিনটি ছিল শনিবার। অত্র এলাকায় সপ্তাহিক বাজার বসে শনিবার। যারা মানুষের বাড়িতে কামলা হিসেবে কাজ করে তাদের শনিবারে বাজারে যাবার পূর্বেই টাকা পাওয়া যায়। রহিছ মিয়া একজনের কাছে দু'শত টাকা পেত। সকালে ঘুম থেকে উঠে টাকার জন্যে গেলেন। কিন্তু টাকা না পেয়ে নিরাশ হয়ে এলেন। ঐ ব্যক্তির টাকা দেয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু তার ঘরে গতকাল চুরি হওয়ায় সে টাকা দিতে পারেনি। এদিকে রহিছ মিয়ার ঘরেও কোন চাউল নেই। কি করবে চিন্তা করে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না রহিছ মিয়া।

বাবুলকে একটা ভাগি ছাগল এনে দিয়েছিল রহিছ মিয়া। অনেক দিন আগেই সে ছাগলটি একটি বাচ্চা দিয়েছিল। সে বাচ্চাটি এখন অনেক বড় হয়েছে। বাচ্চাটি সোমবারে জন্ম হয়েছে বিধায় বাবুল শখ করে বাচ্চাটির নাম রেখেছিল সেমুলী। সেমুলী দেখতে কুচকুচে কালো। কান দু'টি খাঁড়া। বাবুলের আদর যত্ন পেয়ে সেমুলী অতি অল্প সময়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। সারাদিন আলগা থাকে। বাবুল যেখানে যায় সেমুলীও সেখানে যায়। এখনো রান্না ঘরে গিয়ে আছিয়া বেগমকে খুব জালাতন করে। মাঝে মাঝে আছিয়া বেগম বিরক্তি হয়ে সেমুলীকে কান মলি দিয়ে দেয়। কান মলি খেয়ে সে যেন আরও খুশি হয়। এমনকি সে রাত হলে

বাবুলের সাথে ঘুমায়। আর্শ্চাযের বিষয় হচ্ছে; কখনো সেমুলী বিছনায় প্রস্রাব করেনি। বাবুল এই দুষ্ট সেমুলীর ভক্ত হয়ে গেল। তাকে ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না।

রহিছ মিয়া দিশা হারিয়ে আছিয়া বেগমকে নিয়ে ঘরে বসলেন। রহিছ মিয়া বলল, আছিয়া।

কি।

ভাবছিলাম সেমুলীকে বিক্রি করে দেব। তুমি কি কও?

সেমুলীর কথা শুনে আছিয়া বেগমের মনটা ছ্যাৎ করে উঠল। একি কন আফনে। সেমুলীকে বিক্রি করে দিবেন? বাবুল তো ওকে খুব ভালোবাসে। ওতো বেঁচতে দিবে না।

এছাড়া আর কি উপায় আছে বল? না খেয়ে তো আর মরতে পারি না? তুমি বাবুলকে বুঝিয়ে বল। আছিয়া বেগম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, আপনার যা কিছু খুশি করেন। আমি কিছু জানি না।

বাবুল এ খবর শুনে মাকে বলল, আম্মা আব্বাকে বলেন, সেমুলীকে না বেঁচতে।

আছিয়ার মুখে কষ্টের ছাপ। বিক্রি না করলে খাবি কি?

না খেয়ে থাকব, তবু ওকে বেঁচতে দিব না।

তোর বাবাতো আমার কথা শুনে না।

বাবুল কখনো সেমুলীর কাছে যায় আবার কখনো আছিয়া বেগমের কাছে যায়। সেমুলীকে সে আর দেখতে পাবে না। তাকে বিক্রি করে দিবে একথা ভাবতেই তার মাথা ঘুরে যায়। বোবা সেমুলী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে বাবুলের দিকে। কখনো বা জিহ্বা দিয়ে লেহন দিচ্ছে বাবুলকে। মনে হয় যেন তাকে বুঝাচ্ছে আর বলছে, বাবুল তোমরা আজ কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে? তোমাদের কি একটুও দয়া মায়া নেই আমার জন্যে? কিন্তু কে বুঝে এই বোবা প্রাণীর ভাষা।

সেমুলীকে নিয়ে রহিছ মিয়া বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। বাবুল ছেঁড়া একটা হাফপ্যান্ট ও কালা একটা গেঞ্জি গায় দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেমুলীর পেছনে রওয়ানা হল। আছিয়া কেগম বিষন্ন মনে উঠানে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছে কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। রহিছ মিয়া বাবুলকে বার বার বাজারে আসতে নিষেধ করার পরও সে বাজারে যাচ্ছে। সেমুলী কিছু দূর গিয়ে আর যাচ্ছে না। বার বার বাড়ির দিকে ফিরে আসতে চাচ্ছে। এক পর্যায়ে রহিছ মিয়া তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে করতে বাজারে নিয়ে আসল।

বাজারে শত শত ছাগল। বিক্রেতারা ছাগল নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। রহিছ মিয়াও একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে সেমুলীকে নিয়ে দাঁড়ালেন। অনেক্ষণ

বসে থাকার পর এক ক্রেতা আসল। দাম ঠিক হলো পাঁচশত টাকা। রহিছ মিয়া সেমুলীর পিঠে হাত বুলিয়ে ক্রেতার হাতে রশিটি দিল। পরে টাকা পকেটে ভরলো। ক্রেতা যখন সেমুলীকে নিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল তখনই বাবুল অ্যা– অ্যা– করে কাঁদতে লাগল। তার কান্না শুনে ক্রেতা রহিছ মিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, ও কে?

রহিছ মিয়া বললেন, আমার ছেলে।

কাঁদছে কেন?

ও ছাগলটাকে খুব ভালোবাসে। ও চায় না যে, এটাকে বিক্রি করে দিই। কিন্তু ভাই অভাবের তাড়নায় একে বেঁচতে বাধ্য হলাম। জানেন ও আদর করে ছাগলটির নাম পর্যন্ত রেখেছে সেমুলী।

লোকটি হাসল। তাই নাকি?

আল্লাহ হয়তো বাবুলের কান্নাকে কবুল করেছেন। তাইতো ক্রেতা আবার ফিরে তাকালেন। লোকটি হাসলেও তাদের দুঃখটা বুঝলেন। লোকটি বলল, শুনেন ভাই আমি ছাগলটি কিনেছি ভাগি দেয়ার জন্যে। এখন যেহেতু আপনার ছেলে তার মায়ায় কাঁদছে আমার মনে হয় আপনি একে ভাগি নিয়ে গেলে ভালো হবে। ওর কাছে থাকলেই মনে হয় ছাগলটি ভালো থাকবে। অন্যের বাড়িতে গেলে হয়তো স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যেতে পারে।

ক্রেতা লোকের মুখে একথা শুনে রহিছ মিয়াও খুশি। আর বাবুলের খুশিরতো সীমা নেই। লোকটি ছাগলের রশিটি বাবুলের হাতে দিয়ে বলল, নাও তোমার সেমুলীকে। এবার খুশিতো?

তার কথা শুনে বাবুল হেসে ফেলল। আর দু'হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে বলল, খুশি।

তারপর রহিছ মিয়া ও ক্রেতা লোকটি দু'জন দু'জনার ঠিকানা নিল। পরে তারা তিনজন মিষ্টির দোকানে গিয়ে মিষ্টি খেল। ক্রেতা লোকটির নাম ছিল গাফফার। তিনি বললেন, তাহলে রহিছ ভাই আজকের মতো আসি। কোন একদিন হয়তো আপনাদের বাড়িতে চলে আসব।

অবশ্যই আসবেন।

গাফফার সাহেব চলে গেলেন। বাবুল খুশি মন নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। এখন যেন সেমুলীও খুশিতে দৌড়াচ্ছে।

শীতের শেষে প্রকৃতিতে এসেছে মধু বসন্ত। চারদিকে রঙ্গের বিচিত্র সমারোহ। দক্ষিণা বাতাসে মৃদু হিল্লোল মনে জাগায় শিহরণ। গাছে গাছে আমের মুকুলসহ বিভিন্ন ফুল ফুটেছে। বাতাবী লেবুর গাছে ফুল ধরেছে। কোকিল গান গাইছে। নব পল্লবে যেন বাংলার আনাচে কানাচে সবুজের সমারোহ। ফুলে ফুলে অলির গুঞ্জন। সব মিলিয়ে আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতি যেন আজ নববধু সাজে সেজেছে। প্রকৃতির এমন পাগল করা দিন গুলোয় কবিরা হন মুখর। তারা বসন্তকে বরণ করে লেখেন কবিতা। তেমনি করে কবি বেগম সুফিয়া কামাল লিখেছেন কোন এক বসন্তে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি।

'হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি ল'বে না কি তব বন্দনায়?'
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি-
'দক্ষিণ দুয়ারে গেছে খুলি?
বাতাবী নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দক্ষিণা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?'
.....
'হোক,তবু বসন্তের প্রতি কোন এই তব তীব্র বিমুখতা?'
কহিলাম,'উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি তুমি ব্যাথা?'
কহিল সে কাছে সরি আসি–
'কুহেলী উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যসী–
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে! তাহাড়েই পড়ে মনে, ভুলিতে পাড়ি না কোন মতে?'

এমনই এক সকালে সাকিব বাসায় বসে বাড়ির কথা ভাবছে। মা কি এখনও আমার জন্যে কাঁদে? দাদা কি বেঁচে আছে? বাবুল কতটুকু বড় হয়েছে? ইত্যাদি ভাবনায় যখন সাকিব ব্যাকুল, ঠিক তখনই সোনিয়া তার বাসায় আসল। হাতে ছিল একটা উপন্যাস। নাম 'এ জীবন শুধু তোমার জন্য।' লেখক আমির ইশতিয়াক। সোনিয়া বইটি এনেছে সাকিবকে উপহার দেয়ার জন্যে। সাকিবকে চিন্তা করতে দেখে সোনিয়া বলল, কি ভাবছ সাকিব?

সাকিব বলল, কিছু না।

কিছু না মানে! তুমি আমার কাছে লোকাচ্ছ কেন?

কোথায় লোকালাম?

এই তুমি এখন যে কোন একটা বিষয় নিয়ে ভাবছ অথচ তুমি বলছ কিছুই না। একি লুকানো নয়?
সাকিব কি যেন বলবে প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় তার মাথায় হাত বুলিয়ে সোনিয়া বলল, মনটা বেশ খারাপ তাই না?
সাকিব মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল।
আচ্ছা বলতো তোমার ইদানিং কি হয়েছে? এত টেনশন কর কেন? আবার হাত বুলিয়ে বলল, চিন্তায় চিন্তায় শরীরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। কি এমন চিন্তা কর? তুমি কি আমাকে নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা কর?
সাকিব দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চিন্তা কি আমার একটা। তোমাকে নিয়েতো স্বাভাবিক চিন্তা আছেই। তাছাড়া বাড়ির চিন্তায় তো আমার ঘুম আসে না। আবার চাকরির জন্যেও চিন্তা করি।
তুমি এত চিন্তা করিওনা। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বি.এস.সি পাশ কর। তারপর একটা চাকরি যোগাড় করে বাড়িতে যাও। পরে আমাকে...। এটুকু বলেই সে থেমে যায়।
বল থামলে কেন?
কি বলব?
বল, তোমাকে নিয়ে মানে আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। তাইনা?
সোনিয়া লজ্জায় মাথা নেড়ে জবাব দিল, হ্যাঁ।
এবার সাকিবের নজর গেল সোনিয়ার হাতের বইটির দিকে। সাকিব বলল, তোমার হাতে এটা কিসের বই?
ওহ্ আমি ভুলেই গেছি। এটা উপন্যাস বই। তোমার জন্যেই এনেছি। লেখকটা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার। দেখতো তাকে চিনতে পার কিনা। আমার মনে হয় তোমাদের গ্রামের আশে পাশের হবে।
সাকিব আগ্রহ করে বলল, কই দাও দেখি, আমাদের এলাকার লেখকের বই। তাকে তো দেখতেই হয়। একথা বলেই সাকিব বইটি হাতে নিল। বইটির পেছনে লেখকের ছবি ও পরিচিতি পরে সাকিব সোনিয়াকে বলল, ওনিতো আমাদের পাশের গ্রামের। ছোট সময় ধরাভাঙ্গা কত গেছি। ওনাকে দেখছি বলে মনে হয় কিন্তু সঠিক খেয়াল করতে পারছি না।
সোনিয়া বলল, ওনি কিন্তু গল্পটা দারুন লিখেছেন। এত রোমান্টিকতা বর্তমানে পাওয়া যায় না। পরিশেষে কিনা নায়িকা কেয়া নায়ক পলাশের জন্যে জীবনটা বিলিয়ে দিল তবুও সমাজের কাছে তার ভালোবাসা হার মানতে দেয়নি।
হয়েছে আর বলতে হবে না। তাহলে তো আমি পড়ে মজা পাব না।

দেখ এই বইয়ের প্রচ্ছদটা কিন্তু আকর্ষনীয় হয়েছে। এত ঝকঝকে প্রচ্ছদ আর কোন বইয়ে পাই নাই। এ জন্যে লেখক প্রকাশক মো: আবু হানিফ ভাইকে ধন্যবাদ দিতে হয়। নতুন ও প্রথম বই হিসেবে এত ভালো লেখা আর কোন লেখকের পাইনি। দোয়া করি তিনি যেন ভবিষ্যতে এর চেয়ে ভালো উপন্যাস উপহার দিতে পারেন। আর এই বইটি যেন পাঠক হৃদয়ে স্থান লাভ করে।
এই তুমি তো দেখছি ওনার খুব প্রশংসা করছ।
প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য বলেই প্রশংসা করছি।
জানো আমি কিন্তু ইতিমধ্যে ওনার ভক্তও হয়ে গেছি। ওনার দ্বিতীয় বইটার নাম *'প্রাণের প্রিয়তমা'* ঐ বইটার অপেক্ষায় আছি। সাকিব আমাকে কি ওনার বাড়িতে নিয়ে যাবে?
কেন?
ওনার সাথে আমি সরাসরি কথা বলব।
কি বলবে?
বলব তোমার আমার প্রেম কাহিনী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে।
তাই নাকি?
হ্যাঁ।
ঠিক আছে। কিন্তু আমার তো যাওয়ার জায়গা নেই। তোমাকে নিব কি করে। তবে এখন নয় বিয়ের পর কেমন?
এবার সাকিব প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, সোনিয়া আমি যদি কোন দূর্ঘটনার স্বীকার হয় তখন তুমি কি করবে?
সোনিয়া একথা শুনে সাকিবের মুখ চেপে ধরে বলল, সাবধান এমন অলক্ষণে কথা আর কখনো বলবে না। তাহলে কিন্তু ভীষণ কষ্ট পাব। তোমার কিছু হবে না। তুমি আমার পাশে সারা জীবন থাকবে। এসব কথা বলতে বলতে সোনিয়ার চোখের কোণায় এক ফোঁটা পানি এসে গেল।
এ দৃশ্য সাকিব দেখে বলল, তোমাদের একটা স্বভাব কিছু না হতেই কেঁদে ফেল।
সোনিয়া কেঁদে কেঁদে বলে, কাঁদব না তুমি এমন অলক্ষণে কথা বল কেন? তুমি জাননা আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। বল আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।
ঠিক আছে বাবা আর কাঁদতে হবে না। তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও যাব না। তবে এক জায়গায় তোমাকে ছাড়া যাব।
সোনিয়া আশ্চার্য হয়ে বলল, কোথায়?
কবরে।
তুমি আমার সাথে রসিকতা করছ।

ঠিক আছে আর কিছু বলবো না। বলেই সাকিব তার ডান হাতে সোনিয়ার চোখের পানি মুছে দিল।
আবার প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে সাকিব বলল, ঈদতো প্রায় নিকটবর্তী। আর মাত্র সপ্তাহ খানেক বাকি আছে। তো ভাবছি ঈদের দিন তোমাকে একটা উপহার দিব।
কি উপহার।
উহু, এখন বলবো না। এটা সারপ্রাইজ হয়ে থাকবে।
ঠিক আছে আমিও শুনতে চাই না।
এদিকে কথায় কথায় কখন যেন দশটা বেজে গেল তা তাদের খেয়াল নেই। সাকিব এক পলকে সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। সোনিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়েই বলল, কি ব্যাপার তুমি সারাক্ষণ এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে নাকি? ভাত খেতে হবে না?
দেখ সোনিয়া তোমাকে পেলে আমি খাবারের কথা একদম ভুলে যাই।
ঠিক আছে। তাহলে আর রাঁধব না। দেখি তোমার পেট জিতে না ভালোবাসা জিতে।
জান সোনিয়া আমরা আবেগের তাড়নায় অনেক কিছুই বলি, বাস্তবে কিন্তু তা নই। ভালোবাসার জন্যে হয়তো কিছুক্ষণ পেটকে ভুলিয়ে রাখতে পারব। একবারে কি না খেয়ে থাকতে পারব? পেটের সাথে সবকিছু হার মানে। দুনিয়ার সবকিছু একদিকে আর পেট আর একদিকে। তবে পেটের পরেই কিন্তু ভালোবাসার স্থান। পরে অন্যান্য কাজ।
তা সাকিব তুমি ঠিকই বলেছো।
যাও এবার কথা না বাড়িয়ে রান্না করো গিয়ে।
সোনিয়া একটু রহস্য করে বলল, কাকে বলছ?
সাকিব এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, এখানে তো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখছি না।
তাহলে বুঝি আমাকেই বলছ?
হ্যাঁ।
আমি কি তোমার বিয়ে করা বউ নাকি যে, প্রতিদিন রান্না করে খাওয়াবো? একটা বিয়ে করে নাও। সেই বউ তোমাকে রান্না করে খাওয়াবে। আমি অন্তত মুক্তি পাব।
সাকিব তার ফাজলামো বুঝতে পেরে সেও রসিকতা করে বলল, তা ম্যাডাম কাকে বিয়ে করব?

কাকে বিয়ে করবে সে কথা আমি বলব কি করে। তবে তোমার যদি কাউকে পছন্দ থাকে বিয়ে করবে। আর যদি না থাকে তাহলে বাড়িতে গিয়ে তোমার চাচাকে বলবে বিয়ে করাতে। কারণ বাংলাদেশেতো মেয়ের কোন অভাব নেই।
হ্যাঁ। সোনিয়া আমি একজনকে ভালোবাসি। আর আমি তাকেই বিয়ে করব। তবে তার আগে একটি চাকরি নিয়ে নেই। তুমি আর কতদিন ধৈর্য্য ধরে আমাকে রান্না করে খাওয়াও। তারপর বিয়ে করা বউয়ের হাতের রান্না খাব। তখন আর তোমাকে বিরক্ত করব না।
বুঝেছি আমার প্রয়োজন শেষ হলে আর আমাকে বিরক্ত করবে না তাইতো? এই বলেই সাকিবের গায়ে একটা চিমটি কেটে চুলার কাছে চলে গেল।
সোনিয়া রান্না বসাল। সাকিব খাটের এক কোনে বসে গান গাইতে লাগল– সোনিয়া সোনিয়া মনটা নিল কাড়িয়া, আমারে ভালোবাসিয়া...।
সোনিয়া বিরক্তবোধ করে বলল, এই দেখছ কি রসের গান ধরছে আমার নায়কে। আমি গরমে মরছি আর তুমি ছাগলের মত ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে গান গাইছ। তোমার এই ছাগলা কণ্ঠের গান কেউ শুনবে না।
তাহলে কি করতে হবে আদেশ করুন মহারাণী।
সোনিয়ার কাছে ছিল একটা চামচ। চামচটি হাতে নিয়ে নাড়িয়ে বলল, আমার আদেশ শুন।
বল।
যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রান্না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে পাখা দিয়ে বাতাস করবে।
আরে বাপরে! এত বড় আদেশ! আমার কষ্ট হবে না বুঝি।
সোনিয়া মুখ ভেংচিয়ে বলল, আর আমার বুঝি সুখ হচ্ছে তাই না?
তাইতো। সত্যি তোমার কষ্ট হচ্ছে?
আমিতো তোমাকে রেঁধে দেয় আর তুমিতো রাক্ষসের মত খেয়ে ফেল।
সাকিব সোনিয়ার এসব কথায় রাগ হচ্ছে না বরং সেও ইতরামি করে তার প্রতি উত্তর দিচ্ছে।
সাকিব এবার বলল, রাণীর আদেশ কি অমান্য করা যায়। একথা বলেই সাকিব পাখা এনে বাতাস করতে লাগল।
রান্না শেষে দু'জনেই খেয়ে বের হলো অজানা উদ্দেশ্যে। সারাদিন এ বিশাল ঢাকা শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে ঘুরে বেড়াল। শিশু পার্ক, রমনা পার্ক ও সংসদ ভবন ঘুরে যার যার গন্তব্যস্থলে চলে গেল।

ঈদুল আজহার আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। হারিছ সাহেবের মৃত্যুর পর রহিছ মিয়া কোন ঈদে কোরবানি দিতে পারেনি। এবার হারিছ মিয়া ভাবছে পালের লাল গরুটা বিক্রি করে কোরবানিতে শরিক হবে।

দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর রহিছ মিয়া ও আছিয়া বেগম তাদের শয়ন কক্ষে বসলেন। রহিছ মিয়া বালিশটা টেনে হেলান দিয়ে বসলেন। আছিয়া বেগম একটি পান মুখে দিয়ে বলল, কি ব্যাপার আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বেন নাকি?

রহিছ মিয়া বলল, নাহ্। তোমার সাথে কিছু কথা আছে। তার আগে আমাকে এক খিলি পান দাও।

আছিয়া বেগম সুপারি, জর্দা, খয়ার ও চুন দিয়ে পান বানিয়ে স্বামীর নিকট এসে বলল, নেন আপনার পান।

রহিছ মিয়া পানটি হাতে নিয়ে মুখে দিল।

আছিয়া বেগম এবার বলল, এবার বলেন, কি বলবেন?

রহিছ মিয়া আছিয়া বেগমকে সোহাগ ভরা কণ্ঠে ডাক দিল। আছিয়া।

স্বামীর ডাকে প্রিয়তমা স্ত্রী একেবারে কাছে এসে বসলেন। আছিয়া বেগম কাছে আসতেই রহিছ মিয়া ওকে দু'হাতে ঝাপটে ধরে বললেন, ভাইয়া মারা যাবার পর এ পর্যন্ত কোনদিন কোরবানি দিতে পারিনি। প্রতিবছরই তো মাংসের জন্যে বাবুল মানুষের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে। তাই এ বছর আমি কোরবানি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন তুমি কি বল।

আছিয়া বেগম বললেন, কোরবানি দিবেন টাকা কোথায় পেলেন?

টাকা কোথাও পাইনি। ভাবছি লাল গরুটা বিক্রি করে কোরবানিতে শরিক হবো। আল্লাহর রহমতে আমাদের গরুতো এখন চারটা। সামনের বছরটা গেলেইতো বাছুরটা বড় হয়ে যাবে।

আমারও তো ইচ্ছে করে কোরবানি দিতে। কিন্তু আপনার সামর্থের কথা চিন্তা করে কিছুই বলতে পারি না। বাবুল তো প্রতি বছরই কোরবানির ঈদ এলে কেঁদে বেড়ায়। এখন আমার কোন আপত্তি নেই। নিঃসন্দেহে আপনি গরু বিক্রি করতে পারেন।

স্ত্রীর সম্মতি পেয়ে রহিছ মিয়া খুশি হলেন। তাহলে আজ আর কোথাও যাচ্ছি না নিঃশ্চিন্তে এখন ঘুমিয়ে পড়ি। এবার বাতিটা নিভিয়ে আস।

আছিয়া বেগম বাতি নিভিয়ে স্বামীকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। মুয়াজ্জিনের আজানের সুরে স্বামী স্ত্রীর দু'জনের ঘুম ভাঙ্গল। রহিছ মিয়া যথারীতি মসজিদে নামাজ পড়তে গেলেন। চাঁন মিয়াও নামাজ পড়তে গেলেন।

চাঁন মিয়া এখন দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন। মসজিদটা বাড়ির কাছে বলে সেখানে কোন মতে যেতে পারেন। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই তিনি নার্ভাস হয়ে গেলেন। এখন ওনার বয়স ৯২ বছর চলছে। মনে হয় না যে আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন। নামাজ পড়ে এসে চাঁন মিয়া খাটে শুয়ে আছেন। রহিছ মিয়া তাঁর পাশে গিয়ে বসল। চাঁন মিয়া রহিছ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু বলবি বাবা?

রহিছ মিয়া বলল, হ্যাঁ বাবা।

বল্।

রহিছ মিয়া পিতার কাছে কোরবানির কথা বলতে চাইলেই চাঁন মিয়া বললেন, আমার কিছু বলার নেই। আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। এখন তুই যা ভালো মনে করছ তাই কর।

আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

না।

রহিছ মিয়া আর কোন কথা না বাড়িয়ে এখান থেকে চলে গেলেন। সকালে খাওয়ার পর বাবুল, আছিয়া বেগ ও রহিছ মিয়া এক সাথে বসল। কোন প্রসঙ্গ ছাড়াই বাবুল বলে উঠল, আব্বা গরু বেইচ্ছা আমার জন্যে কি আনবেন?

রহিছ মিয়া বললেন, বল্ তোর জন্যে কি আনব?

আমার জন্যে একটা লাল গেঞ্জি ও কালা হাফপ্যান্ট আনবেন। আর একটা কাগজের টুপি।

আর কিছু লাগবে না?

না।

তোর আম্মার জন্যে কি আনব?

শাড়ী।

দাদার জন্যে?

পাঞ্জাবী আর পায়জামা।

তারপর রহিছ মিয়া আর বাবুলকে কোন জিজ্ঞেস করল না। বাবুল তখন বলে উঠল, সাকিব ভাইয়ের জন্যে কি আনবেন আব্বা?

এবার রহিছ মিয়ার মুখে কোন জবাব নেই। ওর নামটা শুনলেই রহিছ মিয়ার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

আছিয়া বেগম বললেন, বাবুল চুপ কর।

বাবুল রাগে বলল, ক্যান চুপ করব? ভাইয়ের নাম কইলেই আপনারা এমন হয়ে যান ক্যান? কি করছে ভাইয়া? ক্যান আপনাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে?
আছিয়া বেগম বললেন, তোর জেনে কোন লাভ নেই।
তারা বাবুলের কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না। তাই বাবুল রাগ করে এখান থেকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আছিয়া বেগম এসে বাবুলকে বললেন, আয়, রাগ করিস না। তোর ভাই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়ে যে কষ্ট দিচ্ছে তাতো সহ্য করতে পারছি না। তাই রাগ করে আবার আমাকে কষ্ট দিস্ না। আস্ বাবা মায়ের সাথে রাগ করতে নেই।
মায়ের এ সমস্ত কথায় বাবুলের চোখে পানি এসে গেল। পরে বাবুল মা বলে আছিয়া বেগমকে ঝাপটে ধরল। আছিয়া বেগম তখন ওকে আদর করে বুকে টেনে নিল।
আজ শুক্রবার। পাশের বাড়ির কয়েকজন মুরুব্বি এসে রহিছ মিয়াকে বলল, কিরে রহিছ, তোর লাল গরুটা নাকি বিক্রি করবি?
রহিছ বললেন, হ চাচা। ভাবছি এটা বিক্রি করে কোরবানিতে শরিক হব।
মুরুব্বীদের মধ্যে একজন বললেন, তা ভালো কথা আমরা ছয়জন আছি। একজন লোক খুঁজছি। তুই যদি হস তাহলে তো আমাদের সাথে হতে পারস। তোর গরুটা দাম দর করে কোরবানি দিয়ে দেই। বাজারে কষ্ট করে গিয়ে কী লাভ?
আপনারা মুরুব্বী মানুষ। আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করেন।
অন্য একজন মুরুব্বী বললেন, তো কত দিতে হবে দাম?
আমি কি কমু চাচা। কত টাকার মাল আছে তা আন্দাজ করে দিয়ে দেন।
অন্য একজন বললেন, চৌদ্দ হাজার টাকা দিব। তোর কোন আপত্তি আছে?
না চাচা আপনাদের উপর কি কিছু কইতে পারি।
আর শোন তোর দুই হাজার টাকা বাদে বাকী বারো হাজার টাকা আগামী কাল দিব।
ঠিক আছে?
আচ্ছা চাচা।
আছিয়া বেগম মুড়ি, চানাচুর নিয়ে আসলেন। নেন মুড়ি, চানাচুর খান।
একজন মুরুব্বী বললেন, আরে সাকিবে মা তা আবার আনতে গেলে কেন?
রহিছ মিয়া বলল, গরিবের বাড়িতে আসছেন আর কি দিব। এতো সামান্য কিছু দিলাম।
আরে এত গলা শুকাচ্ছিস ক্যান?
চানাচুর, মুড়ি খাওয়ার পর লোকমান সাহেব বলল, এখন যাইরে রহিছ। কাল সকালেই তোর টাকাটা দিয়ে দিব।

তাই করবেন চাচা। কাল শনিবার তো বাজার সদাই করতে হবে।
ঠিক আছে। এই বলেই লোকমান ও তাঁর সাথের লোকজন চলে গেল।
রাত আনুমানিক একটা বাজে। সবাই ঘুমিয়ে আছে। এ মুহূর্তে গ্রামবাসী সবাই যার যার ঘরে গভীর ঘুমে অচেতন। রহিছ মিয়া স্বপ্ন দেখছে এবারের ঈদটা একটু আনন্দে কাটাবে। আল্লাহ যার ভাগ্যে আনন্দ দেয় না সে কি করে আনন্দ করতে পারবে?
বাবুল স্বপ্ন দেখছে লাল জামা পড়ে ঈদ করবে। তার স্বপ্ন হয়তো আর পূরণ হবে না। কারণ এইতো গোয়াল ঘরে কয়েকজন চোর ঢুকল। কোন সারা শব্দ নেই। একটি চোর টর্চ লাইট দিয়ে গরুটি দেখে নিল। আর একজন একটা গামছা দিয়ে গরুটির মুখ বেঁধে ফেলল। যাতে গরুটি কোন শব্দ করতে না পারে। অন্য একজন গরুর রশিটি খুলে গরুটিকে বের করে নিল। চোরগুলোর দূরের নয়। তারই প্রতিবেশী। রহিছের সাথে পূর্ব শত্রুতার লেশ ধরে আজকের এমন একটা সময় এ কাজটি করল। হায়রে নিষ্ঠুর নিয়তি!
ফজরের আজান দিতেই আছিয়া বেগমের ঘুম ভাঙ্গল। নামাজ পড়ে তিনি গোয়াল ঘরে গেলেন গোবর ফালানের জন্যে। গোয়াল ঘরে ঢুকতেই দেখে লালু নেই। হায় আল্লাহ! একি করলা তুমি? বলেই আছিয়া বেগম চীৎকার দিয়ে উঠলেন। রহিছ মিয়া স্ত্রীর চীৎকার শুনে দ্রুত আসলেন। লালুকে না দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু বলতে পারছেন না। স্ত্রী কাঁদছেন। হে খোদা কি অপরাধ করেছিল আমার স্বামী? কি অপরাধ করেছিল আমার নিস্পাপ সন্তান। যার জন্যে তুমি আমাদের প্রতি এমন অবিচার করছ?
বাবুল তখনও ঘুমাচ্ছিল। মায়ের চীৎকার শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে আসল। আম্মা আপনি কাঁদছেন ক্যান?
বাবারে তোর লালুরে চোরে নিয়া গেছে।
কি কন আম্মা!
বাবুল ঘোয়াল ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে সত্যি লালু নেই। তারপর জোরে জোরে কাঁদতে লাগল। তাইলে আম্মা আমার আর লাল জামা কিনা হইব না।
আছিয়া ও বাবুলের কান্নায় বাড়ির আশে পাশের লোকজন এসে ভিড় জমালো। সবাই গরুটার জন্যে আফসোস করতে লাগল।
বাবুল চাঁন মিয়ার কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে, দাদা আমি আর নতুন জামা পড়ে ঈদে যেতে পারব না?
চাঁন মিয়া নাতীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন কিছু বলতে পারেন না। নাতীর কান্না দেখে বৃদ্ধ দাদার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল খসে পড়ল।

রহিছ মিয়ার কত স্বপ্ন ছিল গরু বিক্রির টাকা দিয়ে নতুন জামা আনবে। কোরবানিতে শরিক হবে। আনন্দে ঈদ করবে কিন্তু তার সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে আজ চুরমার হয়ে গেল। যারা গরুর দাম ঠিক করছিল তারাও আসলেন। রহিছ মিয়াকে শুধু সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারলেন না তারা।

আজ সারাদিন রহিছ মিয়া মনমরা হয়ে বসে আছেন। কারো সাথে কোন কথা বলেন নি। কত লোকজন বাজারে গিয়ে ঈদের কেনাকাটা করল। কোরবানির গরু কিনল। কিন্তু রহিছ মিয়া কিছুই কিনতে পারল না। পাশের বাড়ির বিশিষ্ট শিল্পপতি এম.এ.হালিম সাহেব ষাট হাজার টাকা দিয়ে মোটা তাজা দেখে একটি গরু কিনে আনলেন। বাড়ির যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর সবাই গরু দেখতে গেল। বাবুলও তাদের দেখাদেখি গরু দেখতে গেল।

আজ ঈদ। বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে আনন্দের বার্তা বইছে। সবাই আজ ঈদের আনন্দে মাতোয়ারা। কিন্তু রহিছ মিয়ার পরিবারে নেই কোন আনন্দ। নেই কোন ঈদ। এদিকে চাঁন মিয়ার অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি এখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। আছিয়া বেগম ও বাবুল তাঁর পাশে বসে চোখের পানি ফেলছেন। যে শ্বশুর কোনদিন আছিয়াকে কোন কটু কথা বলেন নি। সারাক্ষণ তাকে শুধু বউমা বলেই ডেকেছেন, সে শ্বশুর আজ মৃত্যু পথের যাত্রী। তা আছিয়া বেগম ভাবতেই চোখের জল এসে যায়।

সকাল ৭ টায় চাঁন মিয়া এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরদিনের জন্যে পরদেশে চলে গেলেন। যিনি আর এই অশান্তিময় কোলাহল মুখরিত পৃথিবীতে আসবেন না। চাঁন মিয়ার মৃত্যুতে কান্নার রুল পড়ে গেল। এমন একটা ঈদের দিনে, খুশির দিনে চাঁন মিয়ার মৃত্যু হল। বাবুল দাদা...দাদা...বলে চীৎকার করছে। এ চীৎকার প্রকৃতির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পিতার মৃত্যুতে রহিছ মিয়া একেবারে বোবা হয়ে গেছেন। কথায় আছে– 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।' বাড়ির আশে পাশে শোকের ছায়া পড়ে গেল।

ইমাম সাহেব এসে বললেন, ঈদের নামাজের পর ঈদগাহের মাঠে জানাজার নামাজ সম্পূর্ণ করবেন। তাই তাড়াতাড়ি গোসল করানোর জন্যে বললেন। ঈদের দিন বিধায় দূরের আত্মীয় স্বজনরা কেউ আসতে পারে নি। নয়টায় ঈদের জামাত হবে। মাত্র দুই ঘন্টা ব্যবধানে তাকে দাফন করানোর জন্যে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হল। ঈদের নামাজের পর জানাজা অনুষ্ঠিত হল। হাজার হাজার গ্রামবাসী জানাযায় অংশ গ্রহণ করল। কিন্তু হতভাগ্য সাকিবের ভাগ্যে জুটেনি তার দাদার জানাজার নামাজ পড়ার। পারেনি তার দাদার কবরে এক মুঠো মাটি দিতে।

বাবুল কালো একটা হাফপ্যান্ট ও শার্ট পড়ে ঈদগাহে আসে। হাফ প্যান্টের ছেইনটা ছেঁড়া ছিল। নামাজ শেষে চাঁন মিয়াকে কবর দিয়ে রহিছ মিয়া বাবুলকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

সবাইতো আজ ঈদের আনন্দে ব্যস্ত। দু'একজন হয়তো তাদের শোকে শোকাহত। হতভাগা রহিছ মিয়ার জীবনে এমন করুণ পরিণতি আসবে তা সে ভাবতেও পারে না। জীবনের প্রতিটি পদে পদে তাকে আল্লাহ কষ্টে ফেলেছেন। তিনি যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তার বাবা চাকরি হারান। আর তখন থেকে তাদের সংসারে অভাব দেখা দেয়। যখন লেখাপড়া করে ভালো একটি চাকরি করার স্বপ্ন দেখছিল, ঠিক তখন তিনি ভাই হারিছ মিয়াকে হারান। তারপর আসে তার জীবনে করুণ পরিণতি। জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে ভাবীকে বিয়ে করে সংসার গড়তে হয়েছে তাকে। ভাবছিল ভাতিজা বুঝি বড় হয়ে সুখ দিবে কিন্তু সেই ভাতিজাও অভিমানে তাকে ছেড়ে চলে গেল। অভাবের তাড়নায় নিজের ছেলেকেও লেখাপড়া করাতে পারেন নি। আজ এমন খুশির দিনেও খোদা তার সুখ সইল না। গরু চুরি হল। বাবা মারা গেল। একি খোদার ইনসাফ! কেন এত বড় শাস্তি দিলেন তাকে? কেউ কি দিতে পারবে তার উত্তর? আসলে বিপদ যখন আসে তখন চারদিক দিয়ে আসে। আজ যেন রহিছ মিয়ার সেই অবস্থাই হল।

আছিয়া বেগমের চোখ বেয়ে জল পড়ছে আর মনে মনে বলছে, হায়রে পোড়া কপাইল্লা ছেলে, তুই তোর দাদাকে শেষ দেখাটাও দেখতে পারলি না। যেই দাদা তোকে নিয়ে বেশি চিন্তা করত, সেই দাদার কথা একবারও মনে পড়ল না। তোর কি একবারও মনে পড়েনি হতভাগিনি মায়ের কথা। তোকে তো আমি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছিলাম। আড়াই বছর দুধ পান করাইছিলাম। শীতের দিনে কষ্ট করে আগলে রেখেছিলাম। আজ কি সবই ভুলে গেলি?

ভাবতে পারে না আর আছিয়া বেগম। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বাঁধভাঙ্গা নদীর জলের মত অশ্রু তার চোখ বেয়ে পড়ছে। বার বার আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে নেন।

ইতোমধ্যে গ্রামবাসীরা সবাই যার যার পশু কোরবানি করে নিল। অন্যান্য ঈদের মত বাবুল এবার আর অন্যদের গরু জবেহ করা দেখতে যায় না। কারণ আজ যে সে দাদার মৃত্যু শোকে শোকাহত। দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। সবার ঘরে ঘরে মাংস রান্না হচ্ছে। মাংসের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আছিয়া বেগম রান্না ঘরে বাঁশের খুটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাবুল এসে বললো, আম্মা আমরা কি গোস্ত খেতে পারবো না?

আছিয়া বেগম নিরুত্তর।

বাবুল আবার রহিছ মিয়াকে বলল, আব্বা আপনি হালিম সাবের বাড়ি থেকে গোস্ত নিয়ে আসেন।
হারিছ মিয়া বললেন, বাবারে একথা বলে আমারে আর কাঁদাসনে। আমাদের ভাগ্যে আজ গোস্ত জুটবে না।

মনির খান একটা খাসী কোরবানি করলেন। খাসী পাক করার জন্যে সব দায়িত্ব পড়ল সোনিয়ার হাতে। আর বুয়া শুধু ওকে সহযোগিতা করবে। বিকেলে মাংস রান্না শেষ হলে সোনিয়া রূপচর্চা শুরু করে। রূপচর্চা শেষে ছোট্ট টিফিন বক্সে মাংস ভরলো। তারপর বুয়াকে বলল, দিদি আমি বাইরে যাচ্ছি। বাবা জিজ্ঞেস করলে বলবেন, বান্ধবীর বাসায় গেছি।

বুয়া বলল, আচ্ছা।

সোনিয়া সাকিবের জন্যে একাটা পাঞ্জাবী ও মাংস নিয়ে তার বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

সাকিব ঈদ উপলক্ষে গতকাল মার্কেট থেকে সোনিয়ার জন্যে একটা আকাশী রঙের শাড়ী কিনেছে। আজ এটি তাকে উপহার দিবে। সাকিব তার হাত দু'টি মাথার পিছনে রেখে খাটের উপর শুয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। কখন আসবে সোনিয়া সে অপেক্ষায় আছে। এইতো সোনিয়া এসে উপস্থিত হলো। সোনিয়া ঘরে ঢুকতেই সাকিব বিছানা থেকে উঠে বসল। আজ সোনিয়াকে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। পারফিউমের গন্ধে সারা ঘর মাতোয়ারা হয়ে গেছে। অপলক দৃষ্টিতে সাকিব তার দিকে চেয়ে আছে। কিছুই বলছে না। একি সোনিয়া নাকি স্বর্গের হুর নেমে আসছে তা ভাবতে পারছে না সে।

সাকিবের নীরবতা দেখে সোনিয়া বলল, কি দেখছ এমন করে?

তোমার রূপ মাধুর্যকে। তুমি কত সুন্দর! যেন হীরের টুকরো?

তুমি আর আমাকে দেখ নি?

হ্যাঁ দেখেছি, কিন্তু আজকের মত এত সুন্দর দেখিনি। জান, বেহেশতের হুরকে যদি প্রশ্ন করি আমার সোনিয়া কেমন সুন্দর?

হুর বলবে, তুমি বেহেশতে এসে তোমার সোনিয়াকে আমার পাশে দাঁড় করিয়ে দেখে নাও, যে তোমার সোনিয়া আমার চেয়ে সুন্দর।

সাকিবের এ কথা শুনে একটা অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটে উঠল সোনিয়ার ঠোঁটের কোনায়। হয়েছে বাবা আর প্রশংসা করতে হবে না। একথা বলেই সোনিয়া পাঞ্জাবীর প্যাকেটটা খাটের এক কোনায় রেখে টিফিন বক্সটি ওর সামনে ধরে বলল, এই হচ্ছে আমাদের খাসীর মাংস। কথাটা বলতে বলতে টিফিন বক্সটি খুলল। পরে আবার বলল, আগে খেয়ে নাও তারপর কথা বলবো।

সোনিয়া ভাত এনে খাবার মেখে তার মুখে মাংস তুলে দেয়। এভাবে খাবার শেষ হল। এবার সোনিয়া পাঞ্জাবীর প্যাকেটটা ছিড়ে পাঞ্জাবীটা বের করে ওর সামনে ধরল। এই নাও তোমার ঈদ উপহার।
সাকিব বলল, আরে এ আবার কেন আনতে গেলে?
সোনিয়া মাথা ঝাকি দিয়ে বলল, উহু কোন কথা নেই। ঝটপট পড়ে ফেল। দেখি তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে।
সাকিব পাঞ্জাবীটা পড়তেই সোনিয়া টিটকারী করে বলল, বাহ! খুব সুন্দর লাগছে। একেবারে জামাই। কি নতুন জামাই কনে কোথায়?
সাকিব মুচকি হেসে বলল, কনেতো আমার পাশেই আছে।
আমিতো সোনিয়া
এখনই কনেকে দেখাচ্ছি। বলেই টাঙ থেকে সোনিয়ার জন্যে আনা শাড়ীটা বের করল সাকিব। সোনিয়ার সামনে ধরে বলল, এই নাও আমার পক্ষ থেকে ঈদ উপহার। জলদি শাড়ীটা পড়ে কনে সাজ। এখনই তোমাকে বিয়ে করে কনে বানাচ্ছি।
শাড়ীটা দেখে সোনিয়া বলল, ওয়াও! এত সুন্দর শাড়ী। সত্যিই তোমার প্রশংসা করতে হয়। তোমার পছন্দ যে আমার পছন্দের সাথে হুবহুব মিল তা আগে জানতাম না। সত্যি তোমার মত প্রেমিক পেয়ে আমি খুব ভাগ্যবতী। এসব বলতে বলতে সোনিয়া ওলট পালট করে শাড়ীটা দেখছে।
চেয়ে চেয়ে কী দেখছ? তাড়াতাড়ি পড়ে নাও।
সোনিয়া লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, এই তুমি কি বোকা হয়েছ যে তোমার সামনে শাড়ী পড়ব? আমার বুজি লজ্জা করে না। আসলে তুমি কিচ্ছু বুঝ না।
সরি। বলে সাকিব কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বের হল। কিছুক্ষণ পর ঘরে এসে দেখে সোনিয়া বউ ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। সাকিব ঘোমটাটা টেনে বলল, কিগো কনে তোমার বিয়ে হল কোন খানে? তোমার স্বামীর নাম কি?
সাকিবের রশিকতা শুনে সোনিয়া লজ্জায় লাল হয়ে গেল।
কি ব্যাপার কথা বলছ না কেন? ও আচ্ছা, লজ্জা পেয়েছ বুঝি, তাই না। দেখি দেখি বলে তার ডান হাতটা বের করে বলল, হাতে যে মেহেদীর দাগ নেই।
সোনিয়া লাজ রক্তিম মুখে মুচকি হাসল।
সাকিব এবার শাড়ীর আঁচলটা মাথা থেকে নামিয়ে বলল, দেখি দেখি, এদিকে আস তোমর রাঙা ঠোঁটে একখানা ঈদের স্মৃতি এঁকে দেই। বলেই ওকে ঝাপটে ধরে ঈদের স্মৃতি স্বরূপ একটি চুমো দিল।
দু'জনের প্রেমালাপ অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে আষাঢ় মাসের মূষল ধারে বৃষ্টির মত।

আর এদিক দিয়ে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা প্রায় নিকটবর্তী। মনির খান বাসায় বসে আছেন। কি জানি মনে করে সোনিয়াকে ডাকছে। সোনিয়া... সোনিয়া।
বুয়া মনির খানের ডাক শুনে দ্রুত ছুটে আসল। মনির খান বলল, সোনিয়া কোথায়?
ওনি ওনার বান্ধীর বাসায় গেছে। কিছু দরকার লাগবে সাহেব?
হ্যাঁ।
এক কাপ চা এনে দাও।
সন্ধ্যা লগ্নে সোনিয়া বাড়ি ফিরল।
রাত আনুমানিক বারোটা বাজে। মনির খান ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে আছেন। সোনিয়ার চোখে ঘুম নেই। মনটা ছট ফট করছে। ইচ্ছে হল বাইরে বের হতে। রুম হতে বারান্দায় আসতেই দেখে বুয়া বারান্দায় বসে আছে। চোখে পানি। সোনিয়াকে দেখে বুয়া চোখের পানি আঁচল দিয়ে মুছে ফেলল। সোনিয়া বুয়ার দিকে এগিয়ে গেল। আচ্ছা দিদি ঘুমান্নি? আর এখানে বসেই বা কাঁদছেন কেন?
বুয়া বলল, ঘুম আসছে না তাই।
আরো অনেক দিন দেখিছি আপনাকে এভাবে কাঁদতে? এর কারণ কি বলবেন?
কেরে কাঁদছি তাকি শুনবেন।
হ্যাঁ। কেন শুনবো না। আজ আমি আপনার কান্নার রহস্য জানতে চাই।
সে এক বিরাট কাহিনী।
সংক্ষেপে বলেন।
বুয়া তার জীবনের ইতিহাস বলতে লাগল সোনিয়া তার পাশে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনছে।
আজ থেকে ৩০ বছর আগের কথা। আমি তহন যুবতী। আপনার এহন যেই বয়সটা তহন আমার এই বয়সটা ছিল। তহন আমার লগে আমাগ গ্রামের একটি পুলার সাথে প্রেরেম হয়। হের নাম ছিল হাসু। সব পোলামাইয়ারা জন্মের সময় কাঁন্দে। হে নাকি জন্মের সময় খুব হাসছিল, এললেগি এর মা এর নাম রাখছিল হাসু। আমাগর প্রেরেম যহন হয়ে যায় তখন বাড়ির হগলতে জাইন্না ফেলে। আমার মা হাসুকে খুব পছন্দ করতো। তাই আমাগ প্রেরেমে মা কোন বাঁধা দিত না। একদিন মা হাসুদের বাড়িতে আমার বিয়ার প্ররস্তাব নিয়ে যায়। প্ররথম হাসুর মা-বাপ রাজি হইছিল না। পরে রাজি হয়ে গেছে।
এতটুকু বলেই বুয়া থামল।
সোনিয়া আরো জানার জন্যে বলল, তারপর...।
আবার বুয়া বলতে লাগল।

তারপর বিয়া হল। বাসর রাতে আমি যহন ঘুমডা দিয়ে বসে আছি তখন হাসু আমার কাছে আহে। হে তহন আমার ঘুমডা ফালাইয়া বলে, এভাবে ঘুমডা দিয়া আছ ক্যান? মনে হয় আমারে আর দেহনি। আমারে দেখে কি তোমার শরম করছে।

আমি তহন বললাম, কি যেন কন শরম কিহের।

কতক্ষণ চুপ থাকার পর হাসু বলল, এই আমারে ফালাইয়া যাইবা না তো?

নাহ। তোমারে ছাইড়া কোত্তাও যাব না।

তারপর আরো কিছুক্ষণ কথাবর্তা হয়। পরে আমডা দু'জন দু'জনকে ঝাপটে ধরে শুয়ে পড়লাম।

এইটুকু বলেই বুয়া বলল, আর কইতে পারুম না। আমার খুব শরম করছে।

না দিদি আজ আমি আপনার পুরো কাহিনীটা শুনব।

আইচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে হুনেন।

কিছুদিন পর আসল ঈদ। ঈদের আগে হাসু আমার জন্যে একটা লিপস্টিক আনল। আমার হাতে দিয়া কইল, এই হচ্ছে তোমার ঈদের উপহার। আর অহন তোমার ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে আমার গালে একটা চুমা দিবা। তহন আমার গালে দাগ বসবে। ফলে আর কেউ আমার দিকে নজর দিতে পারবে না।

আমিতো তহন শরমে মরি। কি করুম সোয়ামীর কথা কি অমান্য করা যায়। তাই ওরে তহন আমি চুমা দেই।

এর কিছুদিন পর হের ডাইরীয়া হয়। এই ডাইরীয়াই আমার হাসুরে পরপারে নিয়া যায়। আমি তহন হের লাশের উপর পইড়া কাঁনতে থাহি। এমন সময় আমার হরি আইসা আমারে কই, আহহারে কি রসের কান্না কানতাছে। এই হতভাগিনী আমার পুলাডারে খাইছে। পোড়া কপালী ভাগ আমার বাড়ি থেকে। আমি তহন যাইতে চাইলাম না। তখন আমার হওর-হরী জোর কইরা আমারে গলা ধক্কা দিয়া ঘর থেকে বের কইরা দেয়। আর তখন আবার বলে, আজকে আমার পুলারে খাইছস পরে আবার আমডার মাথা খাইবি।

একথা গুলো বলেই বুয়া কাঁদতে লাগল।

সোনিয়া বলল, তারা আপনাকে এত অত্যাচার করছে? তারা কী মানুষ ছিল না কী পশু? আচ্ছা দিদি এর পর কি হয়েছিল শুনি।

বুয়া আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, তারপর থেকে বিশ বছর মাইনসের বাড়িতে কাম করি। বাপের বাড়িতেও যাইনি। পরে আপনার বাপ আপনাদের এনে আনে। জানি না আর কয় দিন থাকতে হবে।

সোনিয়া এবার বলল, আপনি কী আর বিয়ে করেন নাই?

না। আমার বাপ-মাই আমারে বিয়া দিবার অনেক চেরেস্ট্রা করছে কিন্তু সব চেরেস্ট্রাই বাদ হইছে।

কেন বিয়ে করে নি?

আমি জানি মাইয়া মাইনসের বিয়া একবারই হয়। তাই এইডাকে আমি ভাগ্য বলে মেনে নিলাম। আর আমি হাসুকে খুব বেশি ভালোবাসতাম তাই আর কারোর সাথে বিয়া বইতে পারি নাই।

এতটুকু বলে বুয়া বলল, চলেন আজকে আর না। আর একদিন বলাম। এহন মেলা রাইত হইছে। এখন শোওন গিয়ে।

সবোর্চ্চ মার্ক পেয়ে সাকিব বি.এস.সি পাশ করল। কিছুক্ষণ পূর্বে রেজাল্ট বের হয়। রেজাল্ট পেয়ে সাকিব সোনিয়ার জন্যে মিষ্টি নিয়ে আসে। সোনিয়াও রেজাল্টের খরব পেয়ে দ্রুত তার বাসায় চলে আসে।

পাশাপাশি নয়– সামনাসামনি দু'জনে বসে। সাকিব একটা মিষ্টি হাতে নিয়ে বলল, হা কর।

সোনিয়া সাকিবের এই সাফল্যে খুবই গর্বিত। তাই কোন দ্বিধা না করে মিষ্টি খাওয়ার লোভে হা করল। সোনিয়া মনে মনে দাঁতে ঠোঁট কেটে একটা মতলব এঁটে নিল।

সাকিব মিষ্টিটি তার মুখে দিচ্ছে এমন সময় সে মিষ্টিতে কামড় না দিয়ে সাকিবের আঙ্গুলে বসিয়ে দেয় একটা ভালোবাসার কামড়।

উহু! বলে সাকিব হেচকা টান দিয়ে হাতটি সরিয়ে নেয়।

সোনিয়া হেসে বলল, ব্যথা পেয়েছ বুঝি?

নাহ্।

তারপর সাকিব নিজেও কয়েকটি মিষ্টি খেল আর সোনিয়াও নিজ হাতে তাকে খাইয়ে দেয়।

সাকিব কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সোনিয়ার মোলায়েম হাত খানা চেপে ধরে বলল, আচ্ছা সোনিয়া আমাদের প্রেম কি তোমার বাবা জানে?

সোনিয়া বলল, না।

ওনাকে জানানো প্রয়োজন না?

না।

কেন?

কেন এর উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তবে এতটুকু জেনে রাখ আমার বাবা লোকটা খুবই খারাপ। তোমার আমার প্রেম কখনো মেনে নিবেন না। বরং তোমাকে খুন করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। তাছাড়া তিনি একজন চরিত্রহীন।

সোনিয়ার মুখে তার বাবা সম্পর্কে শুনে তার গা ছম ছম করতে লাগল। ভয়ে সে বলল, তাহলে এখন উপায়?

ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমাকে কখনো আমার বাবার সামনে যেতে হবে না। আমি চাই না তুমি আমার চরিত্রহীন বাবাকে দেখ।

তাহলে কীভাবে কি করব?

কোট ম্যারেজ করব।
এটা কি ঠিক হবে?
ঠিক বেঠিক পড়ে বুঝব। একথা বলেই আবার বলল, সাকিব, কিভাবে আমি এই চরিত্রহীন বাবার সংসারে দিন রাত কাটাচ্ছি তা কি তুমি জান? বলেই তার বাবার কাহিনী তাকে বলল।
সোনানিয়ার বাবার দীর্ঘ কাহিনী শুনে সাবিক নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ধৈর্য্য ধর।
তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে এ আজাব থেকে রক্ষা কর।
পাশতো করলাম। এখন একটা চাকরি হলেই তোমাকে বিয়ে করবো।
সন্ধ্যা হয়ে গেছে তাই সোনিয়া চলে গেল।
কিছুদিনের মধ্যেই সাকিবের একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি হয়ে গেল।

গ্রামের একজন অসহায় গরিব মেয়ে আমেনা অনেক কষ্টের পর আই.এ পাশ করে। আই.এ পর্যন্ত সরকার বিনা বেতনে পড়াইছে বিধায় আই.এ পাশ করতে পারছে। তা না হলে এতটুকুও সম্ভব হত না। টাকা পয়সার অভাবে বি.এ পাশটা করতে পারল না। কিছুদিন পূর্বে তার বাবা মৃত্যুবরণ করে। বাবার অকাল মৃত্যুতে তাদের সংসারে নেমে আসে অভাব, অনটন ও দুঃখ ভরা হৃদয় বিদারক করুণ পরিণতি। তার বড় ভাই দু'বছর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় ডান পাটা হারায়। এখন তিনি পঙ্গু অবস্থায় বাড়িতে দিন কাটাচ্ছেন। তার জন্যে কোন হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করতে পারেনি কেউ। অভাবের তাড়নায় আজ আমেনা দিশেহারা হয়ে দু'চোখে সরশে ফুল দেখছে। তার দিকে চেয়ে আছে বৃদ্ধ মা, পঙ্গু বড় ভাই ও ছোট একটা বোন। তার স্বপ্ন ছিল ভালো ভাবে লেখাপড়া করে চাকুরি করে সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন– স্বপ্নই রয়ে গেল। পিতাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিয়ে ভাসিয়ে দেন তাদেরকে দুঃখের সাগরে। আজ আমেনা দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না।

চাকরির সন্ধানে ঢাকায় আসে আমেনা। যেখানে যায় সেখানেই বড় করে সাইনবোর্ড লেখা 'কর্ম খালি নাই'। শুধু মাত্র ফার্মগেট এসে এক জায়গায় দেখতে পেল 'কর্ম খালি'। লেখাটা পড়ে তার মনে একটু আশার আলো ফুটল। আল্লাহর নাম স্মরণ করে অফিসের ভেতরে প্রবেশ করল।

আমেনাকে দেখে সুইপার বলল, কাকে চাই।

আমেনা বলল, আমি বসের সাথে দেখা করতে চাই।

সুইপার বসকে গিয়ে বলল, স্যার আপনের সাথে একটি মাইয়া দেহা করতে চায়। বস এ মুহূর্তে একটা ফাইল দেখছিলেন। সুইপারের মুখে মেয়ে শব্দটা শুনতে পেয়ে তার চেতনা ফিরে এল। বস নয় নারী লোভী মনির খানের এ কোম্পানি। তিনি একাই এর দেখাশুনা করেন। মাঝে মাঝে সুন্দরী রমণী পেলে চাকরির লোভ দেখিয়ে তাকে ভোগ করনে। সেই চরিত্রহীন মনির খান সুইপারকে বললেন, ওকে এখানে আসতে বল।

সুইপার এসে আমেনাকে বলল, এই যে আফা আপনারে স্যার যেতে কইছে।

আমেনা বলল, আচ্ছা ঠিক আছে চল। বলেই সে মনির খানের রুমে প্রবেশ করল।

আমেনা মনির খানের রুমে প্রবেশ করতেই তিনি চমকে উঠলেন। এ যে পূর্ণিমার চাঁদ দেখছেন। তার রূপের জলকে সারা রুম যেন আলোকিত হয়ে গেল। বুকে পুরুষ ঘায়েল করার মত পাহাড়ের মত সু-উচ্চ যন্ত্র দু'টি ব্লাউজ থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে। মনির খান তাকে দেখে হা করে তাকিয়ে রইল। কিছুই বলতে পারছে না। মনে হয় যেন এক্ষুনি খেয়ে ফেলবে তাকে। সে ভাবছে, যে করেই হোক এ মেয়েকে ভোগ করতে হবে। তাকে হাত ছাড়া করা যাবে না। এবার তিনি নিচের দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, বস।

আমিনা চেয়ার টেনে তার সামনা সামনি বসল।

মনির খান ইজি চেয়ারে বসে কলম কামরাচ্ছেন আর বলছেন, এবার বল, তোমার প্রবলেম কি?

আমেনা মিনতি মাখা কণ্ঠে বলল, স্যার আমি এক অসহায় গরিব মেয়ে। টাকার অভাবে আমি আজ আপনার এখানে এসেছি। তবে স্যার ভিক্ষা করতে নয়। বাড়িতে আমার একজন বৃদ্ধ মা, পঙ্গু ভাই ও ছোট একটি বোন আছে। সংসারের হাল আমার হাতে। স্যার দয়া করে যদি একটা চাকরি দেন তাহলে আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

মনির খান ভাবছে, এই তো সুবর্ণ সুযোগ। এখন ওকে যা বলব টাকার জন্যে ও তাই করবে। এভাবে তিনি মেয়েদের দুর্বল দিকগুলো খুঁজে তাদেরকে আয়ত্তে আনেন। পরে সুবিধা মত সময় ভোগ করেন। মনির খান কলমটা টেবিলের উপর রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, চাকরি তোমাকে দিব; তবে একটি শর্ত আছে।

কি শর্ত? চাকরি পেলে আমি আপনার সব শর্ত মেনে নেব। বর্তমানে টিউশনী করে সংসার চালাচ্ছি। যেভাবে হোক স্যার আমাকে একটা চাকরি দেন।

মনির খান কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, শর্ত হল আজ রাতে আমার সাথে থাকবে।

একথা শুনে আমেনা চমকে উঠলো। এমন প্রস্তাব দেবে সে ভাবতেও পারে নি। এ কেমন জঘন্য কথা বলছে। এ আমি কোথায় আসলাম ভেবেই বলল, না স্যার এমন পাপ কাজ আমি করতে পারব না। এতটুকু বলেই আবার ভাবতে লাগল, নারীর সতীত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। সামান্য কিছু অর্থের জন্যে আমার সতীত্ব বিলিয়ে দেব তা হতে পারে না। সতীত্বহীন নারী বেঁচে থাকার চেয়ে সতীত্ব নিয়ে মরে যাওয়া উত্তম। না এখানে থাকা যাবে না। সতীত্ব নিয়ে অন্য কোথাও কাজের খোঁজ নিব। তবু আমি সতীত্ব দিতে পারব না। এখানে থাকলে আমি সতীত্ব নিয়ে বাড়ি যেতে পারব না।

মনির খান তাকে ভাবতে দেখে বললেন, ভাবনার কিছু নেই। বেতন তোমাকে ডবল দেব। মাঝে মাঝে আমাকে একটু সময় দেবে তাহলেই চলবে। তুমি যা

চাইবে তাই পাবে। তোমার পরিবার আর কষ্ট করবে না। তুমি কি চাও তোমার জন্যে তোমার পরিবার কষ্ট ভোগ করুক? নিশ্চয় চাবে না। তাহলে রাজি হয়ে যাও। তোমার ভালো হবে।

না স্যার আমি নারী। তাই বলে আপনাদের মত অসভ্য চার পায়ের জানোয়ার নই। অসহায় হয়ে আজ আপনার এখানে চাকরির জন্যে আসছি। তাই বলে আমার দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে আমাকে ভোগ করতে চাচ্ছেন; তা কিছুতেই হবে না। এ কথা বলেই আমেনা যাওয়ার জন্যে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

মনির খান তার কথায় রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, এই দাঁড়াও। কোথায় যাচ্ছ? বুঝছি সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। এই বলেই ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা বের করে বললেন, দেখেছ আমার হাতে এটা কী?

আমেনা পিস্তল দেখে ভয়ে চুপসে গেল। শামুকের মতো তার গলা থেমে গেল। চোখের সামনে এমন পিস্তল আর কখনো দেখেনি।

মনির খান পিস্তলটি নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললেন, আর এক পা এগুলে এই পিস্তলের বুলেটটা তোমার বুকে গিয়ে পিষ্ট হবে। অতএব আমার কথায় রাজি হয়ে যাও। তাহলে তোমার মঙ্গল হবে।

আমেনা ভাবে, এ কেমন কঠিন পরীক্ষায় সম্মুখীন হলাম। আমি এখন অসহায় খেলার মাঠের বল হয়ে গেলাম। খেলোয়ার যেমন বলকে যেমনি খুশি তেমনি পিঠিয়ে গোল দেয়, ঠিক আমাকে আজ তিনি পিঠিয়ে গোল দেয়ার চেষ্টা করছেন। এখন আমি কি করব? যদি আমার সতীত্ব রক্ষার জন্যে আমার মৃত্যু হয় তাহলে আমার মা, ভাই-বোনের অবস্থায় কি হবে?

আর ভাবতে পারছে না আমেনা। মা, ভাই-বোনের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অবৈধ প্রস্তাবে রাজি করতে বাধ্য হয়। তার সারা শরীর ঘেমে যাচ্ছে।

মনির খান তাকে চুপ থাকতে দেখে ধমক দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার চুপ করে আছ কেন? মরবে নাকি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে।

আমেনা অনেক কষ্টে বলল, আমি রাজি।

এবার মনির খান খুশি হয়ে পিস্তলটি রেখে বললেন, এতক্ষণে লক্ষী মেয়ের মত কথা বললে। একথা বলেই সুইপারকে ডেকে খাবারের ব্যবস্থা করেন।

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে তখন মনির খান আমেনাকে গাড়িতে করে বাসায় নিয়ে আসেন। পরে তাকে তার নিজস্ব রুমে নিয়ে যায়।

মনির খানের যখন যাকে ভালো লাগত তখন তাকে ভোগ করত। তার এই ভোগ করার কৌশল ছিল লোমহর্ষক ও অদ্ভুত প্রকৃতির। তার রুমে আছে রঙিন টেলিভিশন। ভিসিডি সেটসহ অসংখ্য ব্লু-ফিল্মের ক্যাসেট। তাকে সাজানো মদের বোতল। আমেনাকে রুমে এনেই মনির খান ব্লু-ফিল্মের ক্যাসেট লাগিয়ে দিলেন।

একে একে টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠল নারী-পুরুষের উলঙ্গ যৌন মিলনের দৃশ্য। এসব দৃশ্য দেখেতো আমেনার সর্বাঙ্গে কামনার আগুন জলে উঠল। আমেনার আঠার বছরের নিষ্পাপ যৌবন। কখনো যার দেহে কলঙ্কের দাগ লাগেনি। এ পর্যন্ত কোন পুরুষের স্পর্শ লাগেনি। সেই নারীর দেহে আজ প্রথমে পাপের স্পর্শ লাগল। আজ টাকার জন্যে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হতে যাচ্ছে। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। কিন্তু কি করবে? কিছুই করার নেই তার। কারণ পুরুষ শাসিত সমাজে সে যে আজ ভোগের সামগ্রী। সে যে আজ মানুষ নামের নারী লোভী নর পশুর হাতের শিকার।

মনির খান বিবস্ত্র হয়ে মদের বোতল নিয়ে মদ্য পান করছে আর বলছেন, খাবে তুমি? খেয়ে নাও, দেখবে খুব মজা লাগবে। বলতে বলতেই তার দিকে এগিয়ে আসছে।

মনির খানকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমেনা মনে মনে বলছে হে খোদা! তুমি আমাদের দেশে নারী সরকার দিয়েছ। অথচ এই সরকার পারছে না আমাদের মত অসসহায় নারীদের ইজ্জত রক্ষা করতে। আজ সারা দেশে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ হচ্ছে। দেশ বিদেশে নারী পাচার হচ্ছে। কে করবে এর প্রতিকার? এখন একমাত্র তুমিই পার এ সব নর পশুদের হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে।

কোন নারীর প্রতি মনির খানের দৃষ্টি পড়লে তার রেহায় নেই। যে ভাবে হোক ছলে বলে কলা কৌশল সে নারীকে ভোগ করবেই। তার এই পশু লালসায় শিকার হয়ে অনেক নারী দিয়েছে জীবন। ছেড়েছে ঘর বাড়ি। ভেঙ্গেছে স্বামীর সংসার। এমন করে দিন দিন সর্বনাশ করে যাচ্ছে অসহায় নারীর সতীত্ব।

আজ মনির খান আমেনাকে পেয়ে বেহুস হচ্ছেন যে, দুনিয়ার কোন কিছুই তার খেয়াল নেই। এমনকি রুমের জানালা লাগাতে ভুলে গেছেন। নরপশু মনির খান ধীরে ধীরে আমেনার কাছে এসে তাকে বিবস্ত্র করে জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়। আর আমেনা ফুটবলের মত একা মাঠে পড়ে রইল। মনির খান যেমন খুশি তাকে নিয়ে খেলছে।

এদিকে সোনিয়া সকালেই সাকিবের কাছে যায়। বিভিন্ন জায়গায় তাকে নিয়ে ঘুরাফেরা করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরল। হঠাৎ কি মনে করে বারান্দায় আসল। এখানে এসেই তার নজর চলে যায় মনির খানের রুমের দিকে। জানালার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার বাবার কু-কর্মের দৃশ্য।

একি দেখছে সে! এমন জঘন্য কাজ তার বাবা করতে পারে! লজ্জায় ঘৃনায় তার সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। শিহরিত হয়ে উঠল তার সারা শরীর। দৃষ্টি

সরিয়ে নিল ঐ রুম থেকে। দ্রুত রুমে এসে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে, হে আল্লাহ! এ দৃশ্য দেখার আগে আমার মরণ হলো না কেন? মেয়ে হয়ে বাবার ...। নাহ্ আর আমি এ বাড়িতে এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। এ কথা ভেবে কাপড় চোপড় গুছিয়ে একটা ব্যাগে ভরল। তারপর তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসল। একটা রিক্সা ডেকে দ্রুত সাকিবের বাসায় চলে আসে।
সোনিয়াকে ব্যাগ হাতে সন্ধ্যা বেলা আসতে দেখে সাকিব আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল।
সাকিব বলল, কি ব্যাপার সোনিয়া। তুমি না এই মাত্র গেলে! আবার আসলে কেন? আর ব্যাগইবা হাতে কেন?
সোনিয়া সাকিবের হাত ধরে বলল, চল।
কোথায় যাব? বল তোমার কি হয়েছে? তোমার মুখ এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?
তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালোবেসে থাক তাহলে কাজী অফিসে চল। বিয়ে করব।
একি বলছ তুমি! কি হয়েছে বলতো আগে।
বলব, সব বলব। তার আগে এক্ষুণি চল আমাকে বিয়ে করতে হবে।
আহহা সোনিয়া, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?
না আমি পাগল হয়নি। সম্পূর্ণ সুস্থ্য আছি।
তাহলে এ মুহূর্তে বিয়ের কথা বলছ কেন? আর বিয়ের জন্যে তো প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে। আমি তো কোন প্রস্তুতি নেই নি।
আমিও তো কোন প্রস্তুতি নেই নি।
বাড়িতে কিছু না জানিয়ে...।
সে ব্যবস্থা আমি করব।
তাছাড়া টাকা পয়সার ব্যাপার স্যাপার আছে।
সে ব্যাপারে তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না। আমি টাকা নিয়ে আসছি।
না সোনিয়া এত বড় ভুল আমি করতে পারব না। আগে তোমার সব সমস্যার কথা খুলে বল।
না। আজ আমি তোমার কোন কথা শুনব না। এখন যদি তুমি আমাকে বিয়ে না কর তাহলে আমি বাধ্য হব আত্মহত্যা করতে।
একি বলছ তুমি! এ হয় না। না না সোনিয়া এ হতে দেব না আমি।
এখন সাকিব কি করবে। সে এখন উভয় সংকটে পড়ে গেল। এ মুহূর্তে তাকে বিয়ে না করলে যেই ত্যাজী মেয়ে সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করবে। আর বাড়িতে না জানিয়ে বিয়ে করাও ঠিক হচ্ছে না। কারণ কত কষ্ট করে লালন পালন করেছে চাচা, মা তারা। তাদেরকে না জানিয়ে কীভাবে বিয়ে করবে সে। কিন্তু কি করবে।

ভালোবাসার কাছে সব কিছু হার মানে। শুধু ভালোবাসার জন্যে সোনিয়ার কথায় রাজি হতে বাধ্য হল।
সোনিয়ার দেয়া পাঞ্জাবীটা পড়ল সাকিব। আর সাকিবের দেয়া শাড়ীটা পড়ল সোনিয়া। দু'জনে কাজী অফিসে এসে বিয়ের কাজ সমাপ্ত করল। সাকিব সোনিয়াকে জীবনের জন্যে সাথী করে নিয়ে আসে বাসায়। এখন যে সোনিয়া প্রাণের প্রিয়তমা থেকে প্রাণের প্রিয়তমা স্ত্রী হয়ে গেল। বাসার আশে পাশের সবাইকে তাদের বিয়ের কথা জানাল। নববধূ বাসায় এসে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। সাকিব তার স্ত্রীকে রান্নার কাজে সাহায্য করছে। এক সময় সাকিব সোনিয়ার দিকে এক পলকে তাকিয়ে রইল।
সোনিয়া এ দৃশ্য দেখে বলল, কি জামাই এভাবে চাতক পাখির মত তাকিয়ে কি দেখছ? তোমার প্রিয়তমাকে নাকি স্ত্রীকে?
সাকিব ঠোঁঠের কোণায় এক ঝলক হাসির রেখা টেনে বলল, দু'জনকেই দেখছি।
এভাবে একের পর এক মজার মজার কথা বলতে বলতে রান্না শেষ করল।
এদিকে মনির খান তার কু-কর্ম সমাপ্ত করে মেয়েকে খুঁজছেন। কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। বুয়ার কাছেও বলে যায়নি। কোথায় যেতে পারে চিন্তায় অস্থির। এতক্ষণে তার টনক নড়েছে। নিজের রুমে মনির খান ধপাস করে বসে যান। এমন একটা যুবতী মেয়ে বাড়ি থেকে না বলে চলে যাবে তা ভাবতেও পারেনি মনির খান। রাত দশটা বাজে। এখনও বাসায় ফেরেনি। এতে বাবার তো চিন্তা হবার কথায়। কিন্তু এ চিন্তাটা যে মনির খান আগে করেন নি। সাবুর দানার মত ঘাম বেয়ে পড়ছে মনির খানের কপাল থেকে। টেলিফোনের রিসিভারটি হাতে নিয়ে ডায়াল করল ছোট বোন মাহমুদার বাসায়। রিং বেজে উঠল। হ্যালো। কে?
আমি তোর ভাই মনির খান বলছি।
কি উদ্দেশ্যে এতদিন পর বোনকে তলব করলে?
তোদের এখানে কি সোনিয়া এসেছে?
কেন? কি হয়েছে?
ওকে আজ দুপুর থেকে খোঁজে পাচ্ছি না।
বলেন কি!
হ্যাঁ।
কিন্তু ভাই সে তো আমাদের এখানে আসেনি।
এ কথা শুনে মনির খান ফোনটি ছেড়ে দিলেন।
অপর প্রান্ত থেকে মাহমুদা বলছে, হ্যালো। হ্যালো ভাইয়া কথা বল।

নাহ! কোন শব্দ আসছে না। পরে বিরক্ত হয়ে মাহমুদা ফোনটি রেখে দিল। তারপর মনে মনে বলল, ভাই তুমিতো সারা জীবন পাপ করে আসছ। আজ হয়তো সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ তোমার কাছ থেকে মেয়েকে নিয়ে গেছে।
মনির খান তাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে; তাদের সবার কাছে ফোন করে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু কোথাও কোন সোনিয়ার হদিস মেলেনি।
এদিকে সাকিব ও সোনিয়া রান্না শেষ করে খেতে বসলো। সোনিয়া ভাত মেখে বলল, আজ তোমাকে আমি নিজ হাতে খাইয়ে দেব। এতদিন লোকলজ্জার ভয়ে কিছু করতে পারে নি। এখনতো আর বাঁধা নেই। আজ তো তিন অক্ষরের কবুল বলে পৃথিবীর সবচেয়ে আপনজন হয়ে গেলাম।
সাকিব বলল, ঠিক আছে। তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।
সাকিব হা করে তার মুখখানা এগিয়ে দেয়। সোনিয়া ছোট্ট শিশুর মতো তাকে ভাত খাওয়াতে থাকে আর নিজেও খেতে থাকে।
প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি মধুর রাত আসে। আর সেই রাতটির নাম বাসর রাত। বিয়ের পূর্বে যারা যৌন মিলনে লিপ্ত হয়; তাদের জন্যে এ রাত তেমন সুখকর ও রোমান্টিক নয়। তবে যারা সত্যিকার ভাবে যাদের সতীত্বকে বজায় রেখেছে তাদের জন্যে এ রাত হল ফুল শয্যার রাত। তেমনি আজ সাকিব ও সোনিয়ার জীবনে সেই কাঙ্ক্ষিত বাসর রাত এসে উপস্থিত হল।
সোনিয়া খাটের মাঝখানে গিয়ে ঘুমটা দিয়ে বসলো। সাকিব বাহির থেকে প্রকৃতির কাজ সেরে রুমে এসে দরজাটি লাগিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে সে সোনিয়ার নিকট আসল। ঘুমটা টেনে সে থুতনি ধরে বলল, এভাবে ঘুমটা দিয়ে আছ কেন? মনে হয় আমাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছ?
সোনিয়ার তখন মনে পড়ে গেল– বুয়ার সেই যৌবনকালের বাসর রাতের দৃশ্যটি।
কি ভাবছ? কথা বলছ না কেন?
সোনিয়া আমতা আমতা করে বলল, না মানে, ইয়ে তুমি কি যেন বলছিলা?
এই তুমি কিন্তু প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে যাচ্ছ।
আচ্ছা বাবা এসব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে আসো।
সাকিব আর কোন কথা না বাড়িয়ে বাতিটা নিভিয়ে তার পাশে এসে তাকে পাঁজাকোলা করে শুয়ে পড়লো। আশা– আনন্দ– ভয়– সংশয়ের দ্রুত স্পন্দন শুনা যাচ্ছে। দু'জন দু'দিকে মুখ করে খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। কেউ নড়া চড়া করছে না। কেউ কাউকে স্পর্শও করছে না। এভাবে চলল অনেকক্ষণ।
নীরবতা ভেঙ্গে সাকিব সোনিয়ার গায়ে হাত দিয়ে বলল, সোনিয়া। ঘুমিয়ে গেলে নাকি? এস না একটু গল্প করি।

সোনিয়া হাই তোলার মতো শব্দ করে বলল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আজ থাক। একথা বলেই চুপ করে রইল। আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। সাকিবকে বুঝাচ্ছে যে তার সত্যিই ঘুম পাচ্ছে। আসলে কি তাই। এমন মধুর রাতে কি ঘুমানো যায়। কিছুক্ষণ পর সাকিব সোনিয়ার একখানা মোলায়েম হাত আলতো ভাবে টেনে তার নিজের বুকের উপর রাখল। পরক্ষণে তার হাতখানাও সোনিয়ার বুকের উপর রাখল। সোনিয়া কোন বাঁধা দিচ্ছে না। দু'জনের হৃদস্পন্দন দ্রুত বাড়তে লাগলো। তারপর একে অপরের গালে চুমো দিল। তারপর সেই চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী তারা সুখের স্বর্গে প্রবেশ করলো।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন মনির খান তার মেয়েকে পেলেন না, তখন নিরাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন– তিনি যেমনি কোন যুবতী মেয়ে দেখলে ছোলা কলা মনে করে ভোগ করেন; তেমনি যেন আজ তার মেয়েকে কেউ কিডনেপ করে ভোগ করছে। এসব দৃশ্য দেখে না...না... এ হতে পারে না। বলে চীৎকার দিয়ে উঠলেন।

পাখীর কলকাকলীতে সোনিয়ার ঘুম ভাঙল। আড়মোড়া দিয়ে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যায়। তারপর গোসলটা সেরে রুমে এসে কাপড়টা নাড়ল। পরে সাকিবের পাশে এসে দেখতে পেল সাকিব সুন্দর করে ঘুমাচ্ছে। দু'চোখের পাতা এক হয়ে আছে। হাতটা সোনিয়ার বিছানায়।

সোনিয়া সাকিবের পাশে বসে তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, এই সাকিব উঠ। গোসল করবে না?

সাকিব না বলেই নড়ে চড়ে বাঁকা হয়ে চাদরটা টেনে ভালোভাবে ঘুমের ভান ধরল।

সোনিয়া সাকিবের পেটের মধ্যে খোঁচা দিয়ে বলল, এই খাটাস জলদি উঠ। গোসল সেরে নাও।

কিন্তু সাকিব নাছোড়বান্দা। ঘুম থেকে সে কিছুতেই উঠবে না। পরে সোনিয়া বিছানা থেকে উঠে গিয়ে এক গ্লাস পানি আনল। সাথে সাথে চোখে মুখে ঢেলে দিল পানি। এবার না উঠে যাবে কোথায়?

এই কর কি, কর কি। বলেই লাফ দিয়ে উঠল সাকিব। তারপর বলল, নাহ্ তোমার জ্বালায় ঘুমাতে পারব না। সারারাততো ঘুমাতে দিলে না; এখনও দিবে না।

আরে বাবা সারা জীবনতো ঘুমিয়েছ। আজ না হয় ঘুম একটু কম হল। এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল।

সাকিব আর কোন কথা না বাড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। সোনিয়া বিছানাপত্র গুছিয়ে রান্না বসাল। আর সাকিব বাথরুমে ঢুকে ভালোভাবে গোসল করে নিল। গোসল শেষে সাকিব সোনিয়ার রান্নার কাজে সহযোগিতা করতে লাগল। সাকিবের সহযোগী মনোভাব দেখে সোনিয়া বলল, তুমি তো দেখছি একেবারে বৌ পাগল হয়ে গেছ। একটুও বাইরে বের হতে পার না? যাও না বাইরে গিয়ে দেখে আস আজ সূর্যটা কোন দিকে উঠেছে।

সাকিব বলল, দেখ আমার তো আর তুমি ছাড়া আপনজন কেউ নেই। বাইরে গিয়ে কি করব।

সাকিব এবার প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, বিয়েতো হয়ে গেল। এবার বাড়িতে গিয়ে মাকে তো তাঁর পুত্রবধূ দেখাতে হবে।

তাতো অবশ্যই।

তো কবে যাবে?

চল না আজই যাই।
আজ কি আর যাওয়া যাবে, চাকরি আছে না?
তো কবে যাবে?
শুক্রবারে যাব। সেই দিন সাথে দু'দিন ছুটি নিয়ে যাব। তা কেমন হয়?
ভালোই হয়।
তারপর মাকে, ভাইকে, চাচাকে এখানে নিয়ে আসব। কেমন হবে?
খুব ভালো হবে।
জান তোমাকে পেলে বাবুল খুব খুশি হবে। তবে আমার একটাই ভয়। চাচা অন্য ধরনের মানুষ। তিনিতো এমননিতেই আমার প্রতি রেগে আছেন। তাছাড়া তোমার আমার বিয়ে মেনে নিবেন কিনা জানি না।
তা তুমি চিন্তা করো না। আমি চাচাকে বুঝাবো। দরকার হয় আমি তোমার পক্ষ হয়ে চাচার কাছে মাফ চাইব।
আরো অনেক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রান্নার কাজ শেষ হল। দু'জনে খাওয়া দাওয়ার পর একটু রেস্ট নিল। এদিকে সাকিবের অফিসের সময় হয়ে আসছে। সোনিয়া সাকিবের গায়ে কোট পড়িয়ে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে বুতাম লাগাচ্ছে। আর বলছে, শুন, দুপুরে কিন্তু বাসায় এসে খাবে। বাইরের কোন খাবার খাবে না। আর আমার কিন্তু তোমাকে ছাড়া একা একা খেতে ভালো লাগবে না। বলে তাকে একদম বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, শুন এতদিন লজ্জায় তোমাকে চুমো দিতে পারিনি কিন্তু আজ লজ্জা নেই। এই বলে সাকিবের গালে এঁকে দিল ভালোবাসার চুমো। এবার বলল, আজ তোমাকে চুমো দেয়ার অর্থ হলো– তোমার দিকে যেন কোন মেয়ে নজর দিতে না পারে। কারণ তোমার সহকর্মী মেয়েরা না জানি কেমন। তোমার সাথে যদি পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হয়ে যায়। বলেই হাসল। হা... হা... হি... হি...।
সাকিব তার কথায় হেসেই ঘড়ির দিকে তাকাল। ছাড় সময় হয়ে যাচ্ছে।
সাকিব চলে যাচ্ছে। স্ত্রী তার গমনাপথের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।
সাকিব অফিস থেকে আসার পথে সোনিয়ার জন্যে একটা শাড়ী ও কিছু কস্‌মেটিকস নিয়ে আসে।
রুমে এসে কোটটা খুলে সাকিব সোনিয়াকে নিয়ে পদ্মাসনে বসল। এবার সাকিব সোনিয়াকে বলল, চোখ বন্ধ কর।
সোনিয়া বলল, কেন?
ওহু। কোন কথা নেই। যা বলছি তা কর।
সোনিয়া চোখ বন্ধ করতেই সাকিব প্যাকেটটি সোনিয়ার হাতে দিয়ে বলল, এবার চোখ খোল।

সোনিয়া চোখ খুলে বলল, ওয়াও। এত কিছু আমার জন্যে!

হ্যাগো আমার সোনা বৌ। আমার তো আর কোন বৌ নেই; তাই তোমার জন্যে এনেছি। জলদি শাড়ীটা পড়ে সেজে নাও। দেখব তোমাকে কেমন দেখায়।

এখন সেজে কি করব? শুধু কাপড়টা পড়ে নিই।

দেখ তোমাদেরকে আল্লাহ রূপচর্চা করার অধিকার দিয়েছে অন্য পুরুষকে দেখানোর জন্যে নয় শুধু মাত্র স্বামীকে দেখানোর জন্যে। তাই তুমি শুধু এখন নয় প্রতিদিন সেজে আমাকে দেখাবে। এটাই আমি চাই। যাও আর কোন কথা না বলে কাজ কর গিয়ে।

সোনিয়া আয়নার সামনে এসে চুলগুলো সিঁথি করল। সাকিব তার চুল আচড়িয়ে দিল। সাকিবের এসব কাণ্ড কারখানা দেখে সোনিয়া হেসে কুটি কুটি। আবার ভালোও লাগছে তার কাছে। গাল পালিশ মেখে, আই ব্রু, মাশকারা, আইলাইন ব্যবহার করে কপালে কালো টিপ দিল। ঠোঁটে গোলাপী রঙের লিপস্টিক দিল। তার বাবার বাড়ি থেকে আনা গলার নেকলেস, কানের দুল পড়ল। কুচি দিয়ে শাড়ী পড়ল। সাথে ব্লাউজ। বাহ! খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

তখন সাকিবের মুখ থেকে উচ্চারিত হল। You are very beautiful.

আজ সাকিব তার স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে আসবে। কাপড়-ছোপড় গুছিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। আর ভাবছে– দাদা কি এখনও বেঁচে আছে? চাচা কি আমাকে ও সোনিয়াকে মেনে নিবে? অনেক ভাবনা তার মাথায় উঁই পোকার মত কুটকুট করে কামরাচ্ছে।

সোনিয়া সাজছে।

সাকিব বলল, তোমার সাজা শেষ হয়েছে?

সোনিয়া ভালো করে মুখটা আয়নাতে দেখে নিল। পরে ঘুরে বলল, চল।

রুমটা তালা দিয়ে বাসার আশে পাশের সবার কাছে বলে রওয়ানা হলো গ্রামের উদ্দেশ্যে। সোনিয়া কোনদিন গ্রামে আসেনি। আজ তার তার প্রথম; তাও আবার প্রিয়তম স্বামীর সাথে নিজ শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে। সবুজ সমারোহে বেষ্টিত সোনার বাংলার সোনার গ্রামের অনৈসর্গিক দৃশ্যাবলী বড়ই নয়ানাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন দেখে সোনিয়া মুগ্ধ হয়ে গেল।

বাবুল মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে কয়েকজন রাখাল ছেলে মেয়ের সাথে ডাংগুলি খেলছে। এদিক দিয়ে মাঠের আঁকা বাকা পথ হেঁটে সাকিব তার স্ত্রীকে নিয়ে আসছে।

দূর থেকে বাবুল সাকিবকে চিনতে পেরে বলল, আরে সাকিব ভাইয়া না? এই বলে দু'পা সামনে বাড়াল। রক্তের টান আছে বিধায় এত বছর পর দেখেও বাবুল তাকে চিনতে ভুল করে নি। কিন্তু সাকিব বাবুলকে পুরাপুরি চিনতে পারে নাই। সাকিব সামনে আসতেই বাবুল সাবিককে ভাই বলে ঝাপটে ধরল। এবার সাকিব বাবুলকে চিনতে পেল।

বাবুল বলল, আপনি এত দিন কৈ ছিলেন? আপনার জন্যে মা কাঁদতে কাঁদতে চোখে ঘা হয়ে গেছে। চুল পেকে গেছে। আমি আর আপনাকে যেতে দিব না। এই বলে বাবুল কাঁদতে লাগল।

মনের অজান্তে সাকিবের চোখ থেকে এক ফোঁটা জল খসে পড়ল। এ দৃশ্য সোনিয়া চেয়ে চেয়ে দেখছে। রুমাল দিয়ে সাকিব চোখ মুছে বলল, আম্মা কেমনরে?

বেশি ভালো না। বাইত গেলে দেখতে পারবেন।

তোর আব্বা কী বাড়িতে?

না।

কোথায়?

বাজারে গেছে।
বাবুল এতক্ষণ পাশের মহিলাটিকে দেখে ভাবছিল– হয়তো অন্য কেউ কিন্তু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, ভাইয়া এইডা কেডা?
তোর ভাবি।
ভাবির কথা শুনে সোনিয়াকে ঝাপটে ধরে বাবুল বলল, ও বুঝেছি আপনিই আমার ভাইয়ারে আটকাইয়া রাখছেন?
সোনিয়া বাবুলের মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহের বুলিতে বলল, না ভাই আর আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে যাব না।
ঠিক আছে চলেন বাড়িতে যাই। পরে কথা কইব।
বাবুলের সাথে আসা অন্যান্য ছেলে মেয়েরা তাদের এ সব দৃশ্য দেখছে। বাবুল তাদের সবাইকে বলল, তোরা যা আমি বাড়িতে যাচ্ছি। বলেই বাবুল আগে আগে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।
আছিয়া বেগম রান্না ঘরে পাক করছেন। বাবুল দৌঁড়ে পাক ঘরে এসে বলল, মা সাকিব ভাইয়া আসছে।
আছিয়া বেগম আশ্চার্য হয়ে বলল, কি কইলি! সাকিব আসছে!
হ মা। সত্যি কইছি।
কই আমার সাকিব? বলেই দৌঁড়ে ঘরে আসলেন।
সাকিব ঘরে এসে মা বলে ডাক দিতেই আছিয়া বেগম তার সামনে চলে আসলেন। সাকিবকে দেখে আছিয়া বেগমের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। বাবারে বলে চীৎকার দিয়ে তার গলা জড়িয়ে বললেন, এতদিন কোথায় ছিলি? তুই এত নিষ্ঠুর হলি কি করে? চাচার সাথে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেলি। আমাকে একটি চিঠিও দিলি না। আমি কি অপরাধ করেছিলাম। একটি বারের জন্যে দেখতেও আসলি না। আজ কেন দেখতে আসলি?
সাকিব কাঠের পুতুলের মত ঠিক দাঁড়িয়ে মায়ের কষ্টের কথাগুলি শুনে মার হাত ধরে বলল, মা আমাকে ক্ষমা করে দাও।
আছিয়া শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, আমি না হয় তোকে ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু তোর দাদা! যে দাদা তোকে কুলে পিঠে করে মানুষ করলো। সেই দাদা আজ নেই। হায়রে নাদান তাঁকে এক মুঠো মাটি দেয়ার ভাগ্যও জুটেনি তোর কপালে।
সাকিব দাদার মৃত্যুর কথা শুনে মায়ের বুকে মাথা রেখে ডুকরে ডুকরে কেঁদে বলল, একি বলছ মা! সত্যিই দাদা নেই!
হ্যাঁ।
কবে মারা গেল?

ঈদের দিন।

সোনিয়া আতঁকে উঠলো। তার চোখ থেকে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। স্বামী শাশুড়ির দুঃখে নিজেও দুঃখিত।

আছিয়া বেগম বললেন, দাদাকে তো মাটি দিতে পারছনি, এবার তোর মাকে মাটি দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাইস। তারপর সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ও কে? ওকেতো চিনলাম না?

সাকিব আসামীর মত দাঁড়িয়ে নম্র স্বরে বলল, মা এ হচ্ছে তোমার পুত্রবধূ।

পুত্রবধূ! তুই আমাদেরকে না জানিয়ে বিয়ে করতে পারলি? এই জন্যেই কি তোকে দশ মাস দশ দিন পেটে ধারণ করেছিলাম?

সোনিয়া শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, না আম্মা ওর কোন দোষ নেই। ও চেয়েছিল আপনাদেরকে জানিয়ে বিয়ে করতে কিন্তু আমি বাঁধা দিয়েছি।

কেন তুমি তাকে বাঁধা দিলে?

সে বিরাট কাহিনী। সে কথা পড়ে বলব। এ জন্যে আম্মা আমরা দু'জনই ক্ষমাপ্রার্থী।

সাকিব বলল, এখন তুমি তোমার বউমাকে বরণ করে নাও। আশা করি মান অভিমান সব মুছে ফেলবে আজ।

সন্তান যতই অপরাধ করুক না কেন মায়ের কাছে সন্তান ক্ষমার যোগ্য। এতদিন সাকিবের প্রতি তার যে ক্ষোভ ছিল তা এক নিমিষেই শেষ হয়ে গেল লাল টুকটুকে সুন্দরী, রূপসী বউ দেখে। এত সুন্দরী রূপসী বউ দেখে সত্যি আজ আছিয়া বেগম আনন্দিত। আজ তাঁর মনে আর কোন দুঃখ নেই। তাঁর চোখে মুখে ফুটে আছে আনন্দের আভা। হাসির রেখা টেনে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বউমাকে ডাকলেন। এস মা, এস। আমার বুকে এস।

একথা বলতেই সোনিয়া এসে আছিয়া বেগমের পা ধরে সালাম করল।

আছিয়া বেগম সোনিয়াকে হাত ধরে টেনে তুলে বললেন, দেখ মা আমরা মুসলমান। মুসলমানের রীতিতে পা ধরে সালাম করতে নেই। হাত ধরে সালাম করবে। একথা বলে সোনিয়াকে বুকে টেনে নিলেন। তারপর বললেন, তোমার নাম কী?

সোনিয়া।

তুমি আমাদের গরিবের সংসারে মানিয়ে নিতে পারবে তো?

শাশুড়ির বুক থেকে সরে গিয়ে বলল, কেন পারবো না আম্মা?

তুমিতো শহরের মেয়ে।

তাতে কি হয়েছে। আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে মানিয়ে নিতে পারব। যদি আমাকে মেয়ের মত স্নেহ করেন।

মেয়ের মত ক্যান? তুমিতো আমার মেয়েই। আমার কোন মেয়ে নেই। এখন থেকে তুমিই আমার মেয়ে।
ঠিক আছে আম্মা।
দেখ মা আমার ছেলেটা কিন্তু জেদি। ওকে তুমি ভালো করে শাসন করবে।
তা বলেতে হবে না।
মায়ের কথা শুনে সাকিব মুচকি হাসল। আর মনে মনে মাকে ধন্যবাদ দিল বউকে সহজে মেনে নেয়ার জন্যে।
এদিকে বাবুল পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সব কথা শুনলো। পরে ভাবীর হাত ধরে বলল, ভাবী আপনাকে আর যেতে দিব না।
সাকিব বাড়িতে আসছে জেনে বাড়ির আশে পাশের সমস্ত মহিলারা আসল তাকে দেখতে। তাছাড়া আবার শহর থেকে সুন্দরী বউ নিয়ে আসছে। এই জন্যে আরো মানুষ বেশি হল। যেমনিভাবে কোন লোক যদি চার পাঁচ বছর বিদেশ করে দেশে আসে তখন যেভাবে মানুষের ভিড় হয় ঠিক তেননি আজ মানুষে ভরপুর তাদের বাড়ি।
বিকেল বেলা রহিছ মিয়া বাড়িতে আসল। উঠানে এসে ডাকলেন, কইগো বাবুলের মা।
স্বামীর আগমন সংবাদ শুনেই স্ত্রী আছিয়া বেগম বলল, আপনে আসছেন, দেখে যান কে আছসে।
এই অবেলা আবার কে আসছে? বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন রহিছ মিয়া। সাকিব ও সোনিয়াকে দেখে যেন তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তার হৃদয়াকাশে যেন কালো মেঘ জমে গেল। অভিমানে তাঁর গা শিউরে উঠল। সাকিব এগিয়ে এসে বলল, চাচা কেমন আছেন।
রহিছ মিয়া সাকিবের এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, তুই! তুই কেন আসছিস এ বাড়িতে। এ মুহূর্তে এ বাড়ি থেকে চলে যা।
চাচার কথা শুনে সাকিব থমকে দাঁড়াল।
রহিছ মিয়া আছিয়া বেগমের দিকে মুখ করে বলল, ওকে বল্ চলে যেতে। আমি ওর মুখ দেখতে চাই না। ও আমার কেউ নয়। আমার ভাতিজা চার বছর আগেই মারা গেছে।
আছিয়া বেগম স্বামীর হাত ধরে মিনতি মাখা কণ্ঠে বলল, ওগো আপনি নিষ্ঠুর হয়েন না। সন্তান শত অপরাধ করলেও আমাদের কাছে ক্ষমার যোগ্য। আপনি মহান পিতার দায়িত্ব নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন।
সোনিয়াকে দেখিয়ে রহিছ মিয়া বললেন, এই মেয়েটি কে?
ও আমাদের সাকিবের বউ।

যার নিজেরই বাড়িতে জায়গা নেই, সে কিনা আবার বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছে। ও আমার ইজ্জত ধুলোয় মিছে দিয়েছে। আমাদের বংশতো কোন ছেলে প্রেম করে বিয়ে করে নি।
ছেলে যখন ভুল করে ফেলেছে এখন কি করার।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওকে মানুষ করেছিলাম এটা তার কাছ থেকে পাওয়ার জন্যে?
তার রাগ ধীরে ধীরে বাড়ছে। এই তুমি ওকে বল তাড়াতাড়ি বের হয়ে যেতে।
সাকিব ও সোনিয়া নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
আছিয়া বেগম বলল, আপনি কি মায়ের বেদন বুঝবেন? আপনিতো ওকে জন্ম দেননি। ওকে আমি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করছি। আমি বুঝি সন্তানের বেদন। তাই কিনা আপনি পাষাণের মত তাড়িয়ে দিচ্ছেন।
রহিছ মিয়া কর্কশ গলায় বললেন, এই তুমি আর তার সর্ম্পকে একটি কথাও বলবে না তাহলে...।
হঠাৎ রহিছ মিয়ার কথা থেমে গেল।
এতক্ষণে সাকিব মুখ খুলল, চাচা আপনি ভাবছেন এ বাড়ি আপনার একা। এখানে কি আমার থাকার অধিকার নেই?
হ্যাঁ আছে। তোর সম্পদ তোকে ভাগ করে দিচ্ছি। সম্পদ নিয়ে তোর যেখানে খুশি সেখানে চলে যা।
চাচার সাথে সাকিবকে তর্ক করতে দেখে আছিয়া বেগম সাকিবের গালে একটা থাপ্পর মেরে বললেন, তোর কত বড় সাহস। পিতৃতুল্য চাচার মুখে মুখে তর্ক করছিস। কে দিয়েছে তোকে কথা বলার অধিকার? যেই চাচা তোকে ছেলের স্নেহ দিয়ে কোলে পিঠে মানুষ করেছে। বাড়িতে আমাকে রেখে মা ডাকার অধিকার দিয়েছে। যার জন্যে তুই আমাকে পেলে, সেই চাচার সাথে তর্ক করছিস? ভুলে কি গেছস এ সমস্ত কথা?
মায়ের কথায় সাকিব তার ভুল বুঝতে পেরে মায়ের হাত ধরে বলল, মা আমাকে ক্ষমা করে দাও।
আমাকে নয় তোর চাচার হাত ধরে ক্ষমা চা গিয়ে।
এদিকে সোনিয়া চাচার হাত ধরে বলল, চাচা আপনি সাকিবকে ক্ষমা করে দেন। আমাদেরকে দূরে ঠেলে দিবেন না।
রহিছ মিয়া বললেন, তুমি কে? তোমাকেতো চিনি না। তুমি যাও।
সাকিবও এসে চাচার হাত ধরে মিনতি মাখা কণ্ঠে বলল, চাচা যতক্ষণ না আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করবেন ততক্ষণ আপনার হাত ছাড়ছি না।

এদিকে রহিছ মিয়ার মনটা নরম হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তার রাগ কমতে লাগল। তারপর তিনি সোনিয়াকে ধরে বুকে টেনে নিলেন। আর সাকিবকে আছিয়া বেগম বুকে টেনে নিলেন। তারা দু'জন দু'জনের বুক থেকে পৃথক হয়ে গেল। এবার চাচা সাকিবকেও সোনিয়াকে উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু কথা দাও আর কখনো আমাদেরকে ছেড়ে যাবে না।

সোনিয়া বলল, হ্যাঁ চাচা কথা দিলাম আপনাদেরকে ছেড়ে যাব না। তবে আপনাদেরকে ঢাকায় নিয়ে যাব। আর কৃষিকাজ করতে হবে না।

রহিছ মিয়া বললেন, তা কি হয় মা। কৃষিই আমাদের জীবন।

সাকিব বলল, চাচা আমার চাকরি হয়েছে। আমি আর আপনাদেরকে কষ্ট দিব না।

আছিয়া বেগম বলল, সত্যি তোর চাকরি হয়েছে?

হ্যাঁ মা।

তাহলে খোদা আমার ডাক কবুল করেছে।

সাকিব সোনিয়া দু'দিন গ্রামে থাকার পর তাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসল।

সমাপ্ত